দাম : সাত টাকা

স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা।। ৩০ এপ্রিল - ২০১২।।
১৭ বৈশাখ - ১৪১৯

তোষণ নীতির প্রতিবাদে মুখর পশ্চিমবঙ্গ

ইউ পি এ সরকারের কয়লা কেলেঙ্কারি

পৃঃ ...১৪-১৮

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

মমতা দিদি এখন কাজ করছেন, তাই চুপ থাকুন □ ১০

ইমামদের বেতন সর্বনাশের শুরু □ নটরাজ ভারতী □ ১১

একটা ভোট এলে ভাতাটা দশ না হলেও পাঁচ হাজার তো হবেই □ সাধন কুমার পাল □ ১২

কয়লা কেলেঙ্কারি : রাম তেরি কয়লা ময়লা হো গয়া □ এন সি দে □ ১৪

প্রধানমন্ত্রীর সততা প্রশ্নের মুখে : ইউ পি এ সরকারের কয়লা কেলেঙ্কারী □ বাসুদেব পাল □ ১৭

বোধন : সন্ন্যাসী হওয়ার পরীক্ষা □ চতুর্থ পাণ্ডব □ ২১

পরম্পরা : দেবী গন্ধেশ্বরী □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২২

ঐতিহাসিক দুর্গ সিংহগড় □ সোমশুভ্র চক্রবর্তী □ ২৩

খোলা চিঠি : ম্যাডাম, মনমোহনের ভরসা ম্যানেজার মুখোপাধ্যায় □ সুন্দর মৌলিক □ ২৭

পরিবারতন্ত্রই কংগ্রেসের ধ্বংসের কারণ □ জয় দুবাসী □ ২৮

ব্যাঙ্গালোর, মুম্বাইয়ের পর এবার দিল্লিতেও বিজেপি □ ৩১

চোরাকারবারিদের রমরমা মালদার কালিয়াচক সীমান্তে □ তরুণ পণ্ডিত □ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ জনমত : ২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □

অঙ্গনা : ২৬ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭ □ □ অন্যরকম : ৩৩

□ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ইউ পি এ সরকারের কয়লা কেলেঙ্কারি : ১৪-১৭

প্রচ্ছদ পরিচিতি : তোষণ নীতির প্রতিবাদে কলকাতায় কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমাবেশের একাংশ। মঞ্চে ভাষণরত প্রবীণ তোগাড়িয়া ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পাশে কালনায় পুরোহিত সমাজের মিছিল।

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ১৭ বৈশাখ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ৩০ এপ্রিল - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.- Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিশেষ বিষয় : হিমানীশ গোস্বামী স্মরণে

শিবরাম পরবর্তীযুগে বাংলা রহসাহিত্যের মর্যাদারক্ষার ভার যিনি স্বীয় স্কন্ধে বহন করেছিলেন তিনি সদ্যপ্রয়াত হিমানীশ গোস্বামী। মানুষটার মধ্যে যেমন ছিল অফুরন্ত রসের ফল্গুধারা, তেমনি কার্টুন আঁকায় ও ছবি তোলার মধ্যে দিয়ে বহু গুণের সমন্বয়ে এক গুণী মানুষকে পেয়েছিল বঙ্গ সাহিত্য। সত্যি কথা বলতে কি পেয়েছিল স্বস্তিকাও। স্বস্তিকায় ছড়ানো-ছেঁটানো তাঁর বহু গুণমুগ্ধ লেখা ও আঁকার মধ্যে এবার পুনপ্রকাশিত হচ্ছে ১৯৭৮ সালের পুজো সংখ্যায় তাঁর আঁকা কার্টুন সম্বলিত 'কথাবার্তা শব্দ সবই বদলে যাচ্ছে' রম্যরচনার সঙ্গে থাকছে তাঁর সমসাময়িক চণ্ডী লাহিড়ীর মূল্যবান স্মৃতিকথা। এভাবেই হিমানীশ গোস্বামীর প্রতি স্বস্তিকা জানাবে তাঁর বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। এছাড়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে থাকছে বিশেষ রচনা। অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয় তো রয়েছেই। থাকছে অন্যান্য বিষয়ও।

HB®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

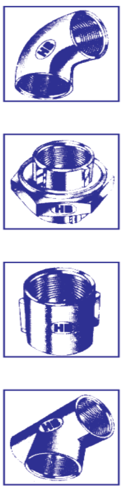

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®
শাহী
গরম
মশলা

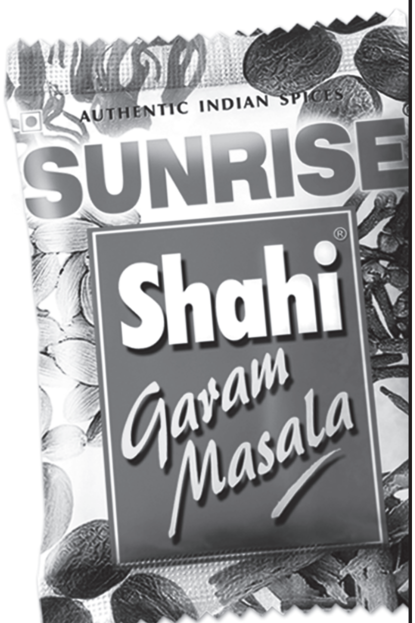

SUNRISE PURE
রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মাওবাদীরা যে ভাষা বোঝে

ইতালিয়ান খৃষ্টান মিশনারী বাসুস্কো পাওলো (Basusco Paulo) এবং ওড়িষার লখিমপুর বিধানসভার বিধায়ক ঝিনা হিকাকা (Jhina Hikaka)-র পর ছত্তিশগড়ের সুকমা-র জেলাশাসক অ্যালেক্স পল মেনন-কে মাওবাদীরা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়া পণবন্দী বানাইয়াছে। ১৮ জন জেলবন্দী কট্টর মাওবাদী নেতাকে মুক্তি দেওয়ার শর্ত ওড়িষার নবীন পট্টনায়েকের সরকার প্রায় স্বীকার করিয়া লওয়ায় পাওলো-কে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ঝিনা হিকাকা-কে মুক্তি দেওয়ার পণ হিসাবে জেলবন্দী মাওবাদী নেতা চেন্দা ভূষণ ওরফে ঘাসি (Ghasi)-কে ছাড়িয়া দেওয়ার দাবী জানানো হইয়াছে যে ৬৫ জনকে হত্যা সহ ১০০টি ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত। এই দাবী না মানা হইলে হিকাকা-র গণ আদালতে বিচার হইবে বলিয়া মাওবাদীদের তরফে জানানো হইয়াছে। সেই বিচারের রায় কি হইতে পারে তাহা সবারই জানা। আর সুমকা-র জেলাশাসক মেননের মুক্তির জন্য অবিলম্বে 'অপারেশন গ্রিন হান্ট' বন্ধ করিবার এবং তাহাদের সহযোগী আটজনকে মুক্তি দেওয়ার দাবী জানাইয়াছে মাওবাদীরা।

মালকানগিরি ও কোরাপুট জেলে বন্দী চাষি মুলিয়া আদিবাসী সঙ্ঘের ২৭ জন সদস্যকে মুক্তি দিতে ওড়িষার বিজেডি সরকার রাজী হইয়াছে। তবুও মাওবাদীরা আপোষ করিতে রাজী নয়। মাওবাদী জঙ্গিদের দমনে ওড়িষা সরকারের ঔদাসীন্যই বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী। ২০০৬ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে মাওবাদীদের হাতে ১৫৮ জন নিরীহ মানুষ নিহত হইয়াছে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য প্রস্তাবিত ন্যাশনাল কাউন্টার টেররিজম সেন্টার (এন সি টি সি) নবীন সরকারের বিরোধিতায় এখনও গঠিত হয় নাই।

দাবী মতো মাওবাদী বন্দীদের মুক্তি না দেওয়া হইলে পণবন্দী মানুষটিকে চরম নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে—এই আশঙ্কায় নত হইলে ভবিষ্যতে জঙ্গিদের সঙ্গে কথাবার্তার ক্ষেত্রে সরকারকে ব্যাপকভাবে ক্ষতির মুখোমুখি হইতে হইবে। তাহাদের দাবীগুলি রাজ্য সরকারকে মানিয়া লইতে বাধ্য করিবার ক্ষেত্রে জঙ্গিদের কাছে ইহা একটি সহজ উপায় বলিয়া চিহ্নিত হইবে। বিশেষত হিকাকার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তো রাজ্য সরকারের কাছে বিদ্রূপজনক।

অপহৃত ঝিনা হিকাকা-কে মুক্তির জন্য মাওবাদীদের দাবী স্বীকার করিয়া যদি ঘাসি (Ghasi)-কে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনে অসন্তোষ সৃষ্টি হইবে। পুলিশের যে দলটি ঘাসি-কে গ্রেপ্তার করিয়াছিল তাহাদের বক্তব্য হইল কোনও মূল্যেই ঘাসি-কে মুক্তি দেওয়া যাইবে না। যদি কট্টর মাওবাদীদের গ্রেপ্তারের পর এইভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে জঙ্গিদমন অভিযান এখনই বন্ধ করিয়া দেওয়া দরকার। তাহাদের প্রশ্ন, মাওবাদীদেরও আপত্তিকর কাজকর্ম চালাইয়া যাইবার স্বাধীনতা দিতে তাহা হইলে অসুবিধা কোথায়? এই ধরনের কট্টর মাওবাদীদের গ্রেপ্তারের জন্য শুধু অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হয় তাহা নয়, প্রাণ বাজি রাখিয়া লড়িতে হয়। এই ভাবে কট্টর মাওবাদীদের মুক্তি দিলে তাহাদের এবং পরিবারের লোকজনদেরও প্রাণহানির আশঙ্কা রহিয়াছে। কিন্তু ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখিয়া বলিতে হয়—নবীন সরকার মাওবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। নিরাপত্তা বাহিনী হতাশায় ভুগিতেছে। সভ্য জগতে চোখের বদলে চোখ–এই নীতি গ্রাহ্য না হইতে পারে, কিন্তু যাহারা নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করিয়া চালিয়াছে, তাহারা বর্বর অসভ্য। মাওবাদীবাদ সন্ত্রাসবাদীই। বন্দুকের ভাষাই তাহারা বোঝে। তাই যে ভাষা তাহারা বোঝে তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে—সভ্যতার দোহাই দেওয়া চলিবে না।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

একদিকে, নব্য ভারত-ভারতী বলিতেছেন—পতিপত্নী-নির্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত, কারণ যে বিবাহে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখ তাহা আমরা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া নির্বাচন করিব; অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন—বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে প্রজোৎপাদনের জন্য। ইহাই এ দেশের ধারণা! প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা-ত্যাগ কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

ইমামদের ভাতা হলে গরীব পুরোহিতদের জন্য নয় কেন? — ডাঃ তোগাড়িয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : মমতা ব্যানার্জী সরকারের রাজ্যের তিরিশ হাজার ইমামকে মাসিক ২৫০০ টাকা ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবার পথে নামল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। গত ২০ এপ্রিল কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় এক বিরাট জনসভায় মুসলিম তোষণের প্রতিবাদে শাণিত বাক্যবাণে মমতা ব্যানার্জীকে সরাসরি আক্রমণ করেন পরিষদের আন্তর্জাতিক কার্যকরী সভাপতি ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া। তিনি বলেন, "পৃথিবীর চল্লিশটির বেশি মুসলিম দেশে কোনও সরকারই ইমামদের বেতন বা ভাতা দেয় না। তাহলে কোন্ যুক্তিতে মমতাদেবী রাজ্যে ইমামদের জন্য ভাতা দিচ্ছেন? গরীব পুরোহিত, বেকার যুবকরা কি দোষ করল হিন্দু হয়ে? বেশিরভাগ হিন্দুদের করের টাকায় নির্লজ্জভাবে মুসলমানদের তোষণ করা চলছে। লক্ষ লক্ষ মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের হাজার হাজার টাকা ছাত্রবৃত্তি, কম সুদে ঋণ দেওয়া হচ্ছে ব্যবসা ও পড়াশোনার জন্য। অথচ ওই একই কাজে হিন্দুরা ঋণ নিলে তার সুদের হার অনেক বেশি। আবার মুসলমানদের ও বি সি (হিন্দু) কোটা থেকে সাড়ে চার শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এরপর হয়ত এস-সি, এস-টি-দের নির্ধারিত আসনে লড়ে মুসলমানরা বিধানসভা ও সংসদেও যাবেন।"

এভাবেই ডাঃ তোগাড়িয়া সরাসরি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ করেন। তিনি সংখ্যালঘু (পড়ুন মুসলমান)-দের জন্য বাম আমলে দশ শতাংশ সংরক্ষণ সত্বর বাতিল করারও দাবী জানান। উত্তরপ্রদেশের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের মুসলিম ছাত্রীদের তিরিশ হাজার টাকা দেওয়ারও তীব্র সমালোচনা করেন ডাঃ তোগাড়িয়া। একইরকম তোষণনীতির জন্য তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকেও একহাত নেন। উপস্থিত জনতাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আপনাদেরও আড়াই হাজার টাকা চাই কিনা? সকলে 'চাই- চাই' বলে দু'হাত তুলে তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে দাবী জানান। শ্রী তোগাড়িয়া সভামঞ্চ থেকেই আগামী কর্মসূচী ঘোষণা করেন—এই তোষণের প্রতিবাদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মে মাসের প্রথম সপ্তাহে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবে। হিন্দু মহাপঞ্চায়েত ডাকা হবে। সেখানে সকল মঠ-মন্দির, মত-পথ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। উত্তরপ্রদেশে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা অখিলেশের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে হস্তাক্ষর সংগ্রহ করে প্রতিবাদ জানিয়ে স্মারক লিপি দেবেন। এদিন সভায় জনসমাগম বেশ ভালো হয়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সহ বেশ কয়েকটি হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন। ডাঃ তোগাড়িয়া যুব সমাজকে এই প্রতিবাদে সামিল হতে ফেসবুক ব্যবহার করে প্রচারের আবেদন জানান এবং নিজের ই-মেল জানিয়ে দেন। অন্যান্যদের মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ হিন্দুদের আগামী বিপদ বিষয়ে সচেতন করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গও শীঘ্র অনুপ্রবেশ ও জনবিস্ফোরণের ফলে পাকিস্তানে পরিণত হতে চলেছে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন এবং প্রবীণ সন্ন্যাসী তথা রিষড়া প্রেমমন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ স্বামী দেবানন্দ ব্রহ্মচারী। উপস্থিত ছিলেন বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী এবং আরও কয়েকজন। সভা পরিচালনা করেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ চিন্ময় দত্ত। পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন সভার জায়গা নিয়ে অনেক টালবাহানা করে। কলেজ স্কোয়ারেও মঞ্চ গড়তে দেয়নি যদিও মৌখিক সম্মতি মিলেছিল। পরিষদের পক্ষ থেকে সভার কথা আগেই পুলিশকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে মমতার ইমামভাতা ঘোষণার পর থেকেই পরিষদ কার্যালয়ে বিভিন্ন মঠ-মন্দির ও হিন্দু সংগঠনের পক্ষ থেকে ফোন আসতে থাকে। সকলেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে অনুরোধ করেন।

সরকারি টাকায় প্রচারের ফানুস আসল কাজে অষ্টরম্ভা মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সরকারি টাকায় মোচ্ছবের আয়োজন করতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা-মাটি- মানুষ সরকার। ঠিক হয়েছে, ১৫ দিন ব্যাপী মেলার আয়োজন করা হবে। তাতে বিভিন্ন দপ্তরের স্টল সাজানো হবে। প্রতিটি দপ্তর মিলন মেলা প্রাঙ্গণে প্রচার করবে কীভাবে গত এক বছরে কাজ হয়েছে।

দিন কয়েক আগে মন্ত্রী-সচিবদের বৈঠকে মমতা ঘোষণা করেছিলেন, গত ৫ বছরের কাজের ৯০ শতাংশ কাজ ১০ মাসেই হয়ে গিয়েছে। সেই হিসাবে বাকি ১০ শতাংশ কাজ দুমাসে হয়ে যাওয়ার কথা। এখন প্রশ্ন তাহলে সরকার অবশিষ্ট চার বছরে কি কাজ করবে?

সরকারি খরচে যে বিশাল টাকা খরচ করে মেলার আয়োজন হচ্ছে তা এককথায় অভূতপূর্ব। কেন্দ্র কিংবা অন্যান্য রাজ্য কোথাও এমন ঘটনা হয়নি। এমনকি মায়াবতীর মতো মুখ্যমন্ত্রীও উত্তরপ্রদেশে এজিনিস করেনি। মমতা এসব কিছুই ছাড়িয়ে গেলেন। সরকারি কাজের ঢাক বাজানোর জন্য দিনের পর দিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। কোনও কাজের উদ্বোধন নয়, শুধুমাত্র শিল্যান্যাস অথবা সূচনা। কবে সেই কাজ শেষ হবে কেউ জানে না। কে টাকা জোগাবে তাও কেউ জানে না। কোথা থেকে টাকা আসবে তাও অজানা। কিন্তু প্রকল্পের পর প্রকল্প ঘোষণা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কাগজে কোটি কাটি টাকা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সবমিলিয়ে ৭০ কোটি টাকার বিজ্ঞাপনের অনুমোদন চেয়ে রেল বোর্ডের কাছে ফাইল পাঠিয়েছে বিভিন্ন জোনাল অফিস। কিন্তু তা অনুমোদন করছে না রেল বোর্ড। ফলে যে সব বড় বড় কাগজ এক সময় রেলের বিজ্ঞাপন নিয়ে আনন্দে ছিল, তারা গত দুবছর ধরে টাকা উদ্ধার করতে পারেনি। একই অবস্থা রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপনেরও। মমতা জেলা সফরে গেলেই ঢেলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সে সব বিজ্ঞাপনের টাকা মেটাচ্ছে না সরকার। সরকারি টাকা মার যাবে না এই আশায় কাগজগুলি বিজ্ঞাপন ছেপে গেলেও কবে তা মিলবে কেউ আশ্বাস দিচ্ছে না।

এরই মধ্যে নতুন ফরমান মেলা করার। এপ্রিল মাসে তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর 'প্রমিসেস ডেলিভার্ড' নামে একটি বই প্রকাশ করে সরকারের কাজের সাফল্য প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে, ওই বইয়ে যা দাবি করা হয়েছে তাতে প্রকাশিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ছবি গুলিছাড়া সবই অসত্য। কোথাও কোনও প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। শুধু উদ্বোধনটুকুই সার। তাও প্রচার চলছেই। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দেখানো হচ্ছে, মমতার সরকার কতটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

সম্প্রতি টাইম ম্যাগাজিন মমতাকে বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী মহিলার মধ্যে অন্যতম বলে তুলে ধরেছে। তা নিয়ে ব্যাপক হইচই হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখতে আর একটি বিশ্ব মানের পত্রিকা দ্য ইকনমিস্ট সদ্য প্রকাশিত সংখ্যায় তাঁকে দ্য মিশচিফমিনিস্টার বলে উল্লেখ করেছে। একটি ছবি প্রকাশ করে দেখানো হয়েছে একটি পায়রাকে মমতা নিজে তুলি হাতে নীল রঙ করছেন। এমন ব্যঙ্গ বোধ হয় বিরল। সরকারি টাকায় নয় ছয় করে যেভাবে মমতা নিজের ইমেজ তুলে ধরার চেষ্টা করছেন, বাস্তব যে তার চেয়েও রুক্ষ তা বোধ হয় এই ছবিই প্রমাণ করে। মানুষকে প্রচার দিয়ে ধোঁকা দেওয়া যায় না। নিজের অভিজ্ঞতায় তা বুঝে নেয় মানুষ। আগামী পঞ্চায়েত ভোটে পরীক্ষা দিতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

সংবাদ প্রতিবেদন

ফাঁসির আসামীদের নিয়ে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করছে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দেশে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীদের ক্ষমা বা মার্জনা ভিক্ষার আবেদন মঞ্জুর করতে পারেন কেবলমাত্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি স্বয়ং। কিন্তু সম্ভবত সেখানেও তাঁকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সুপারিশের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে সেই আবেদন নিয়ে বছরের পর বছর ধরে ভোটব্যাঙ্ক কেন্দ্রিক রাজনীতি করে চলেছে শাসক দল। সূচনা'র অধিকার (আর টি আই) আইনে এ বিষয়ে 'ঝুলে থাকা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া' কত আবেদন জমে আছে--- তা জানতে চেয়েছিলেন আর টি আই কর্মী গোপাল প্রসাদ। রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি জানানো হয়েছে— ১৯৯৮ থেকে এপর্যন্ত ১৮টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং আরও ১৮টি আবেদন এখনও পড়ে রয়েছে।

সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্ট ও দেবিন্দর সিং ভুল্লার-এর রিট আবেদনের শুনানী চলাকালীন কেন্দ্র সরকারের মাধ্যমে মৌখিক ভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনাধীন ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছেন।

রাষ্ট্রপতির কাছে যে ১৮টি ক্ষমাভিক্ষার আবেদন ছিল তার মধ্যে চারটিকে তিনি নাকচ করে দিয়েছেন এবং ১৪টিকে ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বদলে দিয়েছেন। চারটি ফাঁসির মধ্যে— পশ্চিমবঙ্গের ধনঞ্জয় চ্যাটার্জী, অসমের মহেন্দ্রনাথ দাস, দিল্লীর দেবেন্দ্রপাল সিং এবং তামিলনাড়ুতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর হত্যাকারী মুরুগণ। মুরগণের সঙ্গে একই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত নলিনীর সাজা বদলে যাবজ্জীবন কারাবাস করা হয়েছিল এবং তা করা হয়েছিল সংবিধানের ১৬১নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যপালের মাধ্যমে। স্বর্গীয় রাজীব গান্ধীর পরিবারের পক্ষ থেকে নলিনীকে ফাঁসি না দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল।

আফজল গুরু

রাষ্ট্রপতির সচিবালয় থেকে প্রাপ্ত সূচনা অনুসারে বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের কার্যকালে যে তিনটি ক্ষমাভিক্ষার আবেদন নাকচ করা হয়েছে সেগুলি হলো— মহেন্দ্রনাথ দাস ওরফে গোবিন্দ দাস, দেবেন্দ্র পাল সিং এবং মুরুগণ। যে পনেরোটি দয়াভিক্ষার আবেদন ঝুলে আছে তার মধ্যে সংসদ আক্রমণে অভিযুক্ত এবং সুপ্রীম কোর্টে ফাঁসির দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আফজল গুরুর আবেদনও রয়েছে। আছে পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর হত্যায় অভিযুক্ত বলবন্ত সিং-এর আবেদন। যা নিয়ে সম্প্রতি ভালোমতো জলঘোলার রাজনীতি হয়েছে পাঞ্জাবে। মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন আকালী দল জোরদার অভিযান চালিয়েছে। সহযোগী দল বিজেপি অবশ্য তা সমর্থন করেনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল নিজে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা করার আবেদনটি জমা দিয়েছেন। এনিয়ে পাঞ্জাবে চূড়ান্ত রাজনীতি হয়। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত কংগ্রেসও ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাবাসের পক্ষে সওয়াল করেছে। সবমিলিয়ে ৩১ মার্চ ফাঁসি আটকে যায় বর্তমান কেন্দ্র সরকারের হস্তক্ষেপে।

প্রাক্তন সি বি আই প্রধান যোগিন্দর সিংহের মন্তব্য— সুপ্রীম কোর্ট ফাঁসির আদেশ দেওয়ার পরও তা নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করা হচ্ছে। উচ্চতম আদালত যাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে তাকে ক্ষমা করাটা আদৌ উচিত কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সন্ত্রাসবাদীকে ফাঁসি দেওয়াতে ভয়টা কি শুধু সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক ফাটল ধরার? ভোটব্যাঙ্কের সঙ্গে এই বিষয়টাকে জড়িয়ে দেখা কি ঠিক? সরকার ভোটব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়েই সিদ্ধান্ত নিতে অহেতুক কালক্ষেপ করছে। অপরাধী দণ্ড পেলে তদন্তকারী সংস্থা এবং অফিসাররাও খুশি হন। তাদের পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করেন। দয়া বা ক্ষমা প্রদর্শন হলে তাদের পরিশ্রমে জল ঢেলে দেওয়া হয়।

বিতর্কিত সিডি কেলেঙ্কারির জেরে পদত্যাগ করলেন সিঙভি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কংগ্রেসের একান্ত পরিচিত মুখ ও মুখপাত্র অভিষেক মনু সিঙভি সম্প্রতি একটি বিতর্কিত সি ডি কেলেঙ্কারির জেরে আইন বিষয়ক সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও কংগ্রেসের মুখপাত্রের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। বিতর্কিত সিডিগুলিতে সংবাদসূত্র অনুযায়ী একাধিক যৌন দৃশ্যও প্রদর্শিত হয়েছে।

সিডিটির বিষয়বস্তুর একটি বড় অংশে শ্রী সিঙভির উপস্থিতি তাঁকে তো বটেই, গোটা কংগ্রেস দলকেও বেশ প্যাঁচে ফেলে দিয়েছে। বিজেপি'র পান থেকে চুন খসলে নৈতিক অভিভাবকের ভূমিকায় অভ্যস্ত কংগ্রেস পিঠ বাঁচাতে তড়িঘড়ি সিঙভিকে মুখপাত্রের জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সংবাদে আরও প্রকাশ, গত ১৭ এপ্রিল সি আই আই-এর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্যানেল আলোচনা থেকেও শ্রীসিঙভি নিজেকে সরিয়ে নেন।

ইতিমধ্যে ১৩ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই বিতর্কিত সিডিগুলি ইউ টিউবে প্রদর্শিত হওয়ার পর ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। বিপদ বুঝে কংগ্রেস দল ও শ্রী সিঙভি যিনি নিজে একজন স্বনামধন্য সুপ্রীম কোর্টের আইনজ্ঞ, চটজলদি দিল্লি হাইকোর্ট থেকে বিতর্কিত সিডিটির প্রদর্শন, সম্প্রচার, বিতরণ সমস্ত কিছুর উপর একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আদায় করেছেন। মজার কথা হলো, কংগ্রেস দলের শীর্ষ নেতৃত্বে থাকা একজন ব্যক্তির এমন একটি সন্দেহজনক ও কৌতুহলোদ্দীপক সি ডি কাণ্ডে জড়ানোর খবরটি সর্বভারতীয় সংবাদপত্র ও চ্যানেলগুলিতে সেভাবে প্রচারিতই হয়নি। বি. জে. পি মুখপত্র রাজীব প্রসাদ রুডি এ ব্যাপারে ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেছেন, দেশবাসীর প্রকৃত সত্য জানার অধিকার আছে। বিরোধী দলগুলির ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটলে সংবাদমাধ্যম যেমন সোচ্চার হয়, এ ক্ষেত্রে তেমনটা হচ্ছে না বলে শ্রীরুডি বিস্ময় প্রকাশ করেন।

রাজ্য রাজনীতি

পাঁচ বছরের ৯০ ভাগ কাজ ১০ মাসেই শেষ— এক অবাস্তব দাবী

নিশাকর সোম

রাজ্যের রাজনীতিতে প্রধান এবং প্রথম খবর হলো—তৃণমূল সরকার তাদের প্রথম বর্ষপূর্তিতে এগোচ্ছে। তার প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা (হ্যাঁ, ব্যানার্জি বাদ দিয়েছেন) বলছেন, ‘‘পাঁচ বছরের ৯০ ভাগ কাজ ১০ মাসেই শেষ।’’ এরই পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর মূল্যায়ণ—উন্নয়নের খতিয়ান পেশ করতে পারেনি ৩০টি দফতর, ওয়েবসাইটে নিজেদের কাজ আপলোড করছে না ১৫-১৬টি দপ্তর। জঙ্গলমহল, উত্তরবঙ্গে উন্নয়নের কাজ যথেষ্ট ভালো নয়, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে মমতা কোনও উল্লেখ করেননি।

> **মমতা বিভিন্ন ছাত্র-যুবকর্মী সভায় বলছেন, এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নাম লেখাতে। তাহলে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ-এর তালিকাভুক্ত বেকারদের কি হবে? এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে কি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হচ্ছে না?**

এ-কথা সঠিক যে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের অপকর্ম এক বছরে অপসারণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এটাও সত্য যে ‘‘পাঁচবছরের ৯০ ভাগ কাজ ১০ মাসেই শেষ’’ এটা অবাস্তব এবং প্রচারগন্ধী। মানুষের আত্মসন্তুষ্টি থেকে শ্লাঘা আসে—আসে ঔদ্ধত্য! এই প্রসঙ্গে পাঠকের সামনে বিনা মন্তব্যে কয়েকটি সমস্যা তুলে ধরতে চাই।

(১) শিল্প-ক্ষেত্রে বলার মতো তেমন কিছুই হয়নি। লগ্নি টানার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের যেন মুখপাত্র হয়েছেন সালিম গোষ্ঠী। সিঙুর-টাটা-এর ব্যবস্থা কি হয়েছে? ঝুলে রয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রচার ছিল----‘‘সালিম প্রসূনের কোলে বুদ্ধ-নিরুপম দোলে।’’ এখন কি হচ্ছে?

এবার দেখা যাক চাকরি-সংস্থান সম্পর্কে মমতা কি করেছেন। মমতা বিভিন্ন ছাত্র-যুবকর্মী সভায় বলছেন, এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নাম লেখাতে। তাহলে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ-এর তালিকাভুক্ত বেকারদের কি হবে? এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে কি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হচ্ছে না? গ্রামীণ- বেকারি দূর করার জন্য গ্রামীণ কুটির শিল্পের উদ্যোগ কি নেওয়া হচ্ছে? পুরুলিয়ার ‘‘লাক্ষা শিল্প’’-এর কি হল? বাঁকুড়া টেরাকোটা, মেদিনীপুরের ক্ষুদ্রশিল্প, বিশেষ করে কাজুবাদাম শিল্পের উন্নতির এবং রপ্তানির জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে?

শিক্ষার ক্ষেত্রে কি হয়েছে। সমস্ত জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ারম্যানদের সরিয়ে দিয়ে মানিকবাবুকে এ ব্যাপারের সর্বেসর্বা করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের অন্তিমলগ্নে প্রাথমিক শিক্ষকদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। সে-সব বাতিল করে দেওয়া হল। এখন হাজার হাজার মাধ্যমিক শিক্ষকদের নিয়োগের জন্য এস এস সি পরীক্ষা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে----তিন হাজার পদের জন্য তিন লক্ষাধিক আবেদনপত্র পড়েছে। কোনও বন্ধ কারখানা খোলেনি। ডানলপে ছাঁটাই মেনে নেওয়া হলেই মালিক কারখানা খুলবে? বিপ্লবী পূর্ণেন্দুবাবু কি বলেন? যে আর্থিক সঙ্কট সারা দেশজুড়ে নেমে এসেছে, তাতে রাজ্যের সঙ্কট বৃদ্ধি হবেই? এদিকে চুঙ্গি কর-এর দৌলতে জিনিসপত্রের দাম বাড়বেই।

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্তদের মধ্যে অনার্স-পাস দের কি সরাসরি প্রাথমিক শিক্ষক-মাধ্যমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ করা যায় না?

অধ্যাপকদের পরীক্ষার ফলাফল তো ভয়াবহ! শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে কি ফ্রি-হ্যান্ড দেওয়া হয়েছে? স্বাস্থ্য দফতর মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। সরকারি হাসপাতালের আউট ডোরে বিরাট ভীড় হচ্ছে। আমার এক পরিচিত ব্যক্তি এস এস কে এম-এ নেফ্রাইটিস বিভাগের আউটডোরে দেখাতে গিয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি দেখতে পান ভোর ৪টা থেকে লাইন পড়ে—পাঁচশত লোকের পিছনে সেই মহিলা লাইন দিলে, তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। আউটডোরে বিশেষজ্ঞদের দিন কি বাড়ানো যায় না? সরকারি হাসপাতালে আজও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের সাম্রাজ্য অটুট।

পরিবহন-এ শ্যামল চক্রবর্তী ও প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তী এক নৈরাজ্য দুর্নীতিগ্রস্ত অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়ে গিয়েছিলেন। মাধ্যমিকে স্টার পাওয়াকে ডিপোর মেকানিক্যালদের চা-আনার কাজ দেওয়া হয়েছিল। অটোদের দৌরাত্ম্য আজ চরমে উঠেছে। এ ব্যাপারে বিরাট অবদান ছিল শ্যামল চক্রবর্তীর। অটোর মিটার তুলে দেওয়ার অনুমতি দেন শ্যামল চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, ট্যাক্সি রিফিউজাল বেড়েছে। ট্যাক্সি ড্রাইভারদের একাংশ এখন পরিবহন মন্ত্রীকে তাঁদের সমগোত্রীয় ব্যাপারী হিসাবে দেখেন। প্রচার করেন যে মন্ত্রীর ১২ খানা ট্যাক্সি, একাধিক প্রাইভেট বাস আছে। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে হাওড়া স্টেশন-এ যাওয়ার ২৮নং রুটের প্রাইভেট বাসগুলির মালিক নাকি মদন মিত্র মহাশয়? প্রশাসন সম্বন্ধে বলা যায়, সেখানে সবাই তটস্থ, ভীত-সন্ত্রস্ত। মমতা যা বলছেন সেটাই বেদবাক্য হিসাবে প্রশাসন কর্তারা মানছেন। এক ভয়ানক অব্যবস্থা।

দিদি এখন কাজ করছেন, তাই চুপ করে থাকুন

গূঢ়পুরুষের ◘ কলম

খবরটাকে কলকাতার সংবাদমাধ্যম মোটেই গুরুত্ব দেয়নি। দেওয়ার কথাও নয়। আমাদের সেকুলার সংবাদমাধ্যম কট্টর মুসলমান-প্রেমী। মুসলমানের হাঁড়ির খবর ফাঁস করে রাজ্যের মালকিন মমতাজ বানুর বিষ নজরে পড়তে কী কেউ চায়। খুব অস্পষ্টভাবে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের একটা খবর কোনও কোনও কাগজে ছাপা হয়েছে। অথচ খবরটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দিদির তোষণ নীতি পশ্চিবঙ্গকে ধীরে ধীরে নৈরাজ্যের রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে তার এত বড় নমুনা আর দ্বিতীয় নেই। ঘটনাটি এইরকম। গত ১৯ এপ্রিল কলকাতার সবচেয়ে বড় সরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এস এস কে এম চত্বরে বিশাল শামিয়ানা টাঙিয়ে স্থানীয় এক ইমামের জন্মদিন উপলক্ষে চার হাজার নিমন্ত্রিত অতিথিদের পেটপুরে গোস্ত বিরিয়ানি এবং গোস্ত কাবাব খাওয়ানো হয়। এস এস-কে এমের মতো বড় রেফারেন্স হাসপাতালে প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা থেকে অসংখ্য রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়রা আসেন। সেখানে গোটা চত্বর জুড়ে এই নজিরবিহীন জমজমাট গোস্ত বিরিয়ানি খাওয়ার বিনি পয়সার উৎসব দেখে তাজ্জব বনে যান সকলে। হাসপাতালের চিকিৎসকরাও ভেবে পাচ্ছেন না, এমন এলাহি মোগলাই খানাপিনার অনুমতি রাজ্য সরকারের পুলিশ প্রশাসন দেয় কীভাবে! পাঁচটি বড় বড় কাঠের উনুনের ধোঁয়া অবাধে ঢুকেছে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে। রোগীদের অনেকেই শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়েছেন। হাসপাতাল চত্বরে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের চলাচলেও বাধা সৃষ্টি হয়েছে। হাসপাতাল চত্বরে পাঁচটি বড় বড় উনুনে সকাল থেকে ১৪ জন খানসামা-পাচক ব্যস্ত ছিল চার হাজার অতিথির বিরিয়ানি-কাবাব রান্নায়। তৈরি হয় বিশাল প্যান্ডেল। লাগানো হয় রঙিন আলো। সাজসজ্জা দেখে মনে হয় বিবাহ অনুষ্ঠান চলছে। পাত পেড়ে গোস্ত বিরিয়ানি খাওয়া দাওয়া চলে গভীর রাত পর্যন্ত। ইমামের জন্মদিন উপলক্ষে হাসপাতাল চত্বর পরিণত হয় হট্টমেলায়। চিৎকার-হৈচৈতে হাসপাতালের স্বাভাবিক কাজকর্ম শিকেয় ওঠে। হাসপাতালের প্রতিটি নিয়ম কানুন প্রকাশ্যেই লঙ্ঘন করে ইমামের ভক্তরা। বিশেষ করে অসুবিধায় পড়েন ম্যাকেঞ্জি, কার্জন, ভিক্টোরিয়া এবং আলেকজান্দ্রা ব্লকের রোগীরা। কাঠের উনুনের ধোঁয়ায় তাঁরা শ্বাসকষ্টে পড়েন। কলকাতা হাইকোর্ট একাধিকবার ঘোষণা করেছে যে ঐতিহাসিক স্মারক সৌধ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের তিন কিলোমিটার পরিধিতে প্রকাশ্যে আগুন জ্বালিয়ে রান্না করা যাবে না। এস এস কে এস হাসপাতালের অবস্থান ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ঠিক উল্টো দিকেই। ভবানীপুর থানার ওসি বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন, 'আমি জানি হাসপাতালের মধ্যে রান্নাবান্না চলছে। প্রতি বছরই এমন হয়।' সব জেনেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন? জবাব নেই। বোঝাই যায় যে বিশেষ ক্ষমতাবান মহল থেকে নিষেধ ছিল। যেমন, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের মুখপাত্র ডাঃ অসিত বিশ্বাস বলেছেন, এমন কিছু হয়েছে আমি জানতাম না। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান বিনয়কান্তি দত্ত বলেছেন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের এত কাছে খোলা জায়গায় বড় বড় কাঠের উনুন জ্বেলে রান্না হচ্ছে তা আমি জানতাম না। কেউই কিছু জানতেন না। অথচ ১৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত হাসপাতাল চত্বরে হাইকোর্টের রায়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে খানাপিনার এলাহি কাণ্ডকারখানা চললো। এস এস কে এম হাসপাতালের কেষ্টবিষ্টু কর্তারা জানতেই পারলেন না। অথচ ইমামের ভক্তবৃন্দের মুখপাত্র শেখ সফিউদ্দিন সাংবাদিকদের কাছে বুক বাজিয়ে বলেছে, 'আমরা চার হাজারেরও বেশি মানুষের জন্য মোগলাই খানার আয়োজন করেছিলাম।' সরকারি হাসপাতাল চত্বরে প্যান্ডেল খাটিয়ে, আগুন জ্বেলে রান্নাবান্না করার জন্য আগাম অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কী, এমন আজব প্রশ্নের জবাব দেয়নি শেখ সাহেব। হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞাও শোনেনি শেখ সফিউদ্দিন সাহেব। ভিক্টোরিয়া মেমেরিয়ালকে দূষণ থেকে রক্ষা করার জন্য সদাই তৎপর স্বেচ্ছাসেবী সুভাষ দত্ত মশাই কী বলবেন? দিদি বলেছেন, চক্রান্ত চলছে। চক্রান্তকারীদের মা মাটি মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। হয়তো তাই সুভাষবাবুদের মতো পরিবেশ সচেতন স্বেচ্ছাসেবীরা নীরব থাকাটাই শ্রেয় বলে মনে করছেন। দিদি একাধিকবার বলেছেন, ইমামরা আর্থিকভাবে অতি দরিদ্র। তিনি ইমামদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণাও করেছেন। সত্যি কী রাজ্যের ইমামরা দরিদ্র? একজন দরিদ্র ইমাম তাঁর জন্মদিনের উৎসবে অক্লেশে চার হাজারের বেশি লোককে বিরিয়ানির দাওয়াত দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে দারিদ্র্যের ডেফিনেশনটি নতুনভাবে লিখতে হবে। গত ২০ এপ্রিল, অর্থাৎ বিরিয়ানি কাণ্ডের পরেরদিন, কলকাতার সুপরিচিত খালসা গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রীরা ভবানীপুরের যদুবাবুর বাজারের সামনে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখায়। কারণ, 'দিদির' তথাকথিত মা মাটি মানুষের সরকার শিখ সম্প্রদায়ের পরিচালিত এই স্কুলের সরকারি অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। খালসা গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা ও শিক্ষিকারা সরকারি সাহায্য বন্ধের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করছে শুনে তৃণমূল কর্মীরা লাঠি নিয়ে তেড়ে যায়। স্কুলের অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করে। অথচ এই ঘটনার কিছুদিন আগে 'দিদি' সগর্বে ঘোষণা করেছেন, রাজ্য সরকার দশ হাজার মাদ্রাসাকে আর্থিক অনুদান দেবে। গত ১০ জানুয়ারি নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক দলীয় সভায় নেত্রী ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের ১৬ লক্ষ মুসলিম ছাত্রছাত্রীকে রাজ্য সরকার বৃত্তি দেবে। অতি সম্প্রতি, রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বসিরহাট এলাকায় তিন লক্ষ কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বিতরণ করেছেন। এর জন্য বছরে ১০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে বলে দিদি সগর্বে বসিরহাটের জনসভায় ঘোষণাও করেছেন। অথচ রাজ্যের শিখ সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের স্কুলকে সরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত করা হলো কেন? উত্তরটা আমাদের সকলেরই জানা আছে। বলা যাবে না। কারণ সেক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত হতে হবে। তাই সবাই চুপ করে থাকুন। মা মাটি মানুষের নেত্রী এখন সোনার বাংলা গড়তে কোমরে আঁচল বেঁধে কাজে নেমেছেন। নিজেই প্রশ্নপত্র তৈরি করছেন। নিজেই উত্তরপত্র পরীক্ষা করে ১০০/১০০ নম্বর দিচ্ছেন। নিজেই নিজের পিঠ চাপড়াচ্ছেন। তাই সবাই এই নৈরাজ্যের বঙ্গভূমিতে চুপ করে থাকুন। শব্দ করবেন না। 'দিদি' এখন কাজ করছেন!

ইমামদের বেতন সর্বনাশের শুরু

নটরাজ ভারতী

সর্বনাশের শুরু। শুধু মুখটা দেখা গেছে। তাতেই আঁতকে উঠছি। এখনও অনেক বাকি। শেষ কোথায়। কারও জানা নেই। সরকারি পয়সায় ইমামদের সম্মেলন। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এটা হয়। পণ্ডিত পুরোহিত সম্মেলন কষ্টকল্পনা। ইমামদের মাস-মাইনে দেওয়া হবে। এমন ভাব যেন এ রাজ্যে ইমামরাই একমাত্র গরীব। আর গরীব নেই। তাই ইমামদের মাস-মাইনের ব্যবস্থা। ইমামদের একমাত্র কাজ ইসলাম ধর্মের প্রচার। হিন্দু ভারতকে মুসলিম ভারতে পরিণত করার জন্য চেষ্টা চালানো। সরকার সেই কাজের জন্য টাকা দেবে। জনগণের টাকায় মৌলবাদকে প্রশ্রয়। এরপরও আমরা চুপ থাকবো। বসে বসে নিজেদের সর্বনাশ দেখবো।

ইমামরা কখনও সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলে না। সব ধর্ম সমান এমন কথাও বলে না। ধর্মনিরপেক্ষতা নামক দুর্গন্ধের কথাও বলে না। তারা তাদের লক্ষ্যে স্থির অবিচল। কাফের রাষ্ট্র ভারত। মানে শত্রু রাষ্ট্র। এটা ইসলামের রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। কোথাও কখনও শোনা যায়নি ইমামরা সেবাপরায়ণ। কোথাও কখনও দেখা যায়নি ইমামরা সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী শোনাচ্ছেন। দেশ অথবা সমাজ গঠনেও ইমামদের কোনও ভূমিকা নেই। তারা প্রত্যেক মুসলমানকে প্রতিনিয়ত মনে করান— তুমি আগে মুসলমান পরে অন্যকিছু। বরং মুসলিম সমাজকে এগোতে দেয় না ইমামরা। আধুনিক শিক্ষার চরম বিরোধী এই ইমামদের জন্যই বেতনের ব্যবস্থা।

মুসলমানদের উন্নতি করা মমতার লক্ষ্য নয়। এ আগুন নিয়ে খেলা নয়। রীতিমতো গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে খেলা। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আশঙ্কায় দিন গোণা। সবাই বুঝছে। কেউ কোনও কথা বলছে না। কথায় কথায় মোমবাতি নিয়ে ধর্মতলায় ধর্না দেওয়া প্রাণীকুল নীরব। চরম এবং চূড়ান্ত অন্যায়। দেশের সর্বনাশ। রাজ্যের সর্বনাশ। সব থেকে সর্বনাশ মুসলমানদের। এসব জেনেও সব চুপচাপ। শিক্ষিত-অতিশিক্ষিত দিদির তল্পিবাহকেরা নীরব।

সরকারি টাকায় ইমাম সম্মেলন। অন্যায়, ইমামদের বেতন দেওয়া অন্যায়। সরকারি টাকায় ভোটের প্রভাব। অন্যায়। এত অন্যায়। এক সঙ্গে। কলকাতায় প্রচুর বুদ্ধিজীবী। কেউ সুশীল। কেউ প্রগতিশীল। এই সব 'শীল' যুক্ত বুদ্ধিজীবীদের সব বুদ্ধিকে দিদি শিল চাপা দিয়েছেন। কেউ আর মাথা তুলতে পারছে না। বয়োবৃদ্ধ ঢোঁড়া সাপের মতো। নড়নচড়ন নেই। পুকুরপাড়ে রোদে কাত মেরে পড়ে থাকে।

সোজা-সাপ্টা

ইমাম-ভাতা

ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি চলবে না। সভায় সভায় তর্কের ফোয়ারা। একসময় ছিল। এখন আর নেই। এখন সবাই বুঝেছেন ধর্মছাড়া রাজনীতি হয় না। তাই প্রকাশ্যে মৌলবাদকে উস্কানি দিয়ে দিদি পার পেয়ে যাচ্ছেন। কেউ প্রশ্ন তুলছেন না— অহেতুক শুধু মুসলিম ধর্মের বাহকদের এই সুবিধা কেন? সব মাথা বন্ধক আছে দিদির কাছে। কলকাতার সব বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধির ঘরের চাবি দিদির জিম্মায়। ''দেহিপদ পল্লব মুদারম।।'' কথায় কথায় যারা টিভি চ্যানেলে 'ফোনো' দিতে (টেলিফোনে মতামত) অথবা 'বাইট' দিতে অভ্যস্ত তারাও নীরব। এ নিয়ে কিছু বলার নেই। ক্ষুরধার বুদ্ধির সাংবাদিকদের বুদ্ধির ক্ষুরে জং, যখন তখন নানা বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুষ্ঠান হয়। তা সে মোহর- কুঞ্জেই হোক অথবা মিলেনিয়াম পার্কে। সেসব মুখে গরম বক্তৃতা লোকে গিলে ভাবে কি দারুণ! ইমামদের বেতন দেওয়া উচিত কিনা এ নিয়ে কোনও বিতর্কসভা হয়নি। কোনও চ্যানেল সাহস করবে না। কোনও বুদ্ধিজীবী বলতে আসবে না। ইমামদের বেতন দেওয়া মানে দেশের আঙুলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া। এই সহজ সত্য সবাই বুঝছেন। কিন্তু কেউ 'ফোনো' দেবে না। বাইট দেবে না।

ইমামরা দরিদ্র। এই চরম ও চূড়ান্ত মিথ্যাটাকে বারে বারে আউড়ানো হচ্ছে। গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে হিন্দুধর্মের পুরোহিত আর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। দারিদ্র্য সন্ন্যাসীর ভূষণ। কোটি টাকার গদি ছেড়ে ভিখারী-সন্ন্যাসী হয় অনেকে। এটা হিন্দু ধর্মের পরম্পরা। তাই তারা কিছু প্রত্যাশা করে না। পূজারী ব্রাহ্মণ। বাড়িতে বাড়িতে, দোকানে দোকানে পুজো করে বেড়ান। এটাই তৃপ্তি এটাই আনন্দ। অপরের মঙ্গলকামনায় নিজের আনন্দ। আর ইমামরা? ছোট-বড় শহরের বড় মসজিদের ইমামরা থাকেন রাজার হালে। আতর সুরমা আর পোশাক দেখে কে বলবে গরীব! অনেকের একাধিক বিবি। জমজমাট সংসার। গ্রামে গঞ্জের ইমামদের উপার্জন কম। কিন্তু গরীব কি? ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রামের লোকের।

পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু গ্রামে ইতিমধ্যে ঝামেলা শুরু হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানে নয়। পুরোহিতে ইমামেও নয়। গ্রামবাসীদের সঙ্গে ইমামদের। কারণ অমুসলমানের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নেওয়া অপরাধ। ইমাম একমাত্র মুসলমানের দেওয়া অর্থে পেট ভরাতে পারে। বেশকিছু গ্রামের লোকেরা তাদের ইমামকে তা জানিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টাকা মানে কাফেরের টাকা। সে টাকা নিলে আর ইমামতি করা চলবে না। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মসজিদ থেকে বের করা দেওয়া হবে। এসব কথা বললেন এক পরিচিত ইমাম।

সুতরাং একটাই পথ খোলা। সব ইমাম যদি কাফেরের টাকা নিতে না চায় তাহলে কি হবে? সরকারের প্রধানকে কি মুসলমান হতে হবে। ইমামরা এখন কোন শর্ত দিতেও পারে। যদি দেয় তাহলে পঞ্চায়েত ভোটের আগে মমতাজ ব্যানার্জী থেকে 'মমতা বানু' হতে বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু তারপর?

২৫০০ টাকায় কি হয়!

একটা ভোট এলে ভাতাটা দশ না হলেও পাঁচ হাজার তো হবেই

সাধন কুমার পাল

কেউ বলছেন মমতা নুন খাইয়ে দিয়েছে এখন ইমামরা গুণ গাইতে থাকবে। কেউ বলছেন মমতা ক্ষমতায় এসেই দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যে নিজের ও দলের ভবিষ্যৎ গড়তে সরকারি কোষাগার থেকে ইমামদের সহায়তার নামে বড় একটি বিনিয়োগ করে রাখলেন। কারণ এখন 'কৃতজ্ঞ' ইমামরাই মমতার জেতার জন্য মুসলমান ভোটের জিম্মা নিয়ে নেবেন। আবার কেউ বলছেন বহুধর্মের দেশে ইমামদের বেতন দিয়ে শুধু মাত্র ইসলামের প্রচার প্রসারের ব্যবস্থা করে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গে মমতা একটি বিষবৃক্ষ বপন করে দিলেন। আর ইমামরা কানাঘুষো করছেন 'মমতার মতো রাজনীতিকদের প্রাণভোমরা আমাদের হাতে। ফলে ভোট ছাড়াই আড়াই হাজার আর ভোট এলে এটা পাঁচ বা দশ হাজার হতে কতক্ষণ!'

হ্যাঁ, গত ৩ এপ্রিল মঙ্গলবার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম বিভাগ আয়োজিত মসজিদের ইমামদের সম্মেলন নিয়ে আমজনতার তরফে এরকমই প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে। 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতে সরকারি উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় এরকম ধর্মসম্মেলন আয়োজনের নজির হিসেবে এটিই বোধহয় প্রথম। এই সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইমামদের জন্য ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে মাসিক ২৫০০ টাকা, গৃহহীন ইমামদের বাড়ি তৈরির জন্য তিনকাঠা করে জমি এবং অর্থ সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরকে এবং জেলার ক্ষেত্রে জেলা শাসকদের ইমামদের বাড়ি তৈরির জন্য প্রয়োজন মতো জমির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও ঘোষণা করা হয়েছে এই প্রকল্প তত্ত্বাবধানের জন্য গঠন করা হবে একটি টাস্কফোর্স। এই কমিটিতে গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন ইমাম ছাড়াও থাকবেন ওয়াকফ কমিটির চেয়ারম্যান মহঃ আব্দুল গণি।

ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কোনও বিশেষ ধর্মের ধর্মযাজকদের শুধুমাত্র তার নিজস্ব ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ চালানোর জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ বরাদ্দ করা যায় কিনা একমাত্র 'সাম্প্রদায়িক' বিজেপি ছাড়া মমতার এই পদক্ষেপের ঔচিত্য নিয়ে এখনও পর্যন্ত তেমন কেউ প্রশ্ন তোলেনি। মুসলমান ছাড়া অন্য উপাসনা পদ্ধতির ধর্মযাজকদের সরকারি দাক্ষিণ্য থেকে ব্রাত্য করে রাখার এই প্রবণতা যে ভারতের মতো বহু মত ও পথের মানুষের দেশে এক বিপজ্জনক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করতে চলেছে এ প্রশ্ন কিন্তু কেউ তোলেনি। সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের প্রহারের সামনে, সংখ্যালঘু বা অতি পিছিয়ে পড়া জাতীয় শব্দবন্ধগুলিকে শিখণ্ডী হিসেবে খাড়া করে, শুধুমাত্র মুসলমানদের দারিদ্র্য অনুন্নয়ন নিয়ে নানা পরিসংখ্যান তুলে ধরে, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ থেকে শুরু করে নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা ভোগী ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে দেশের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রবণতা রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে যে সেই ১৯৪৭-এর মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করছে এ প্রশ্নও কিন্তু কেউ তুলছে না। অবশ্য বলা ভালো এই প্রশ্ন তোলার সাহস এখন কারো নেই। কারণ রাজনৈতিক দলগুলির মুসলিম ভোট হারানোর ভয়ে আর তথাকথিত বিদ্বজনরা ধর্মনিরপেক্ষ তকমা, কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো পেট্রোডলারের দাক্ষিণ্য হারানোর ভয়ে কাতর। বর্তমান ভারতে এই দুর্বলতা, এই ভয়, এই আত্মপ্রবঞ্চনা দেশকে এমন এক অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যা ভাবতে ভয় হয়।

মোট কথা মুসলমান ভোট ব্যাঙ্কের প্রভাব ও রাজনীতিকদের ক্ষমতার লোভ এখন এদেশে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছে যে মুসলমান তোষণ আর ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ দুটো যেন সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই তোষণ নীতির ফলে মুসলমান সমাজ কতটা এগোচ্ছে তা বিচার সাপেক্ষ হলেও মমতা-মুলায়মের মতো রাজনীতির ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র স্বার্থে যে ওদের দেশের মূলস্রোতের সঙ্গে একাত্ম হতে দিচ্ছে না এটা স্পষ্ট।

একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 'জোর যার মুলুক তার' নামক জঙ্গলের নীতিটিই হচ্ছে এখন ভারতীয় রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি। যে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী ভোটের ময়দানে তুলনায় বেশি শক্তিশালী দেশের সরকারটি যেন তাদেরই। সরকারি সুযোগ সুবিধের নিরিখে আমজনতা ও অন্য সম্প্রদায়

গোষ্ঠীর অবস্থানটি যেন অনেকটা উচ্ছিষ্ঠ ভোগী বা কৃপা প্রার্থীর মতো। ফলে এদেশে শুধু ধনী ও গরীবদের মধ্যেই নয়, বৈষ্যমের পাহাড় সৃষ্টি হচ্ছে হিন্দু দরিদ্র ও মুসলমান দরিদ্রের মধ্যেও।

সংখ্যালঘু হয়েও এদেশের মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে সংখ্যাগুরুদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। কারণ ওদের সিংহভাগই রাজনৈতিক ভাবে মুসলমান স্বার্থ নিয়ে দরাদরি করে সংগঠিত হয়ে ভোট দেয়। যে দল বেশি সুযোগ-সুবিধের আশ্বাস দেয় সেই ভোট তাদের দিকে যায়। বছরের পর বছর ধরে এই সাম্প্রদায়িক ভোটের রাজনীতি চলে আসার ফলে এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞাও পাল্টে যেতে শুরু করেছে। ফলে এদেশে সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষ ক্ষুধা দারিদ্র্য বেকারির জ্বালায় জর্জরিত হলেও শুধুমাত্র মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের আর্থসামাজিক অবস্থা যাচাইয়ের জন্য সাচার কমিটি বা রঙ্গনাথ মিশ্র কমিটির মতো কমিটি গঠন, এই সমস্ত কমিটির সুপারিশ মতো ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ থেকে শুরু করে নানা সুযোগ সুবিধা ও প্রতিশ্রুতি প্রদানও ধর্মনিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হয়।

মোট কথা মুসলমান ভোট ব্যাঙ্কের প্রভাব ও রাজনীতিকদের ক্ষমতার লোভ এখন এদেশে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছে যে মুসলমান তোষণ আর ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ দুটো যেন সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই তোষণ নীতির ফলে মুসলমান সমাজ কতটা এগোচ্ছে তা বিচার সাপেক্ষ হলেও মমতা-মুলায়মের মতো রাজনীতির ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র স্বার্থে যে ওদের দেশের মূলস্রোতের সঙ্গে একাত্ম হতে দিচ্ছে না এটা স্পষ্ট। বৃটিশ ভারতে এ দেশের মুসলমান সমাজের এই রাজনৈতিক দরাদরির ক্ষমতা গান্ধী-নেহরুর মতো তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের মুসলমান তোষণ নীতির মতো। এর চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামের দেশ দুটি। এই তোষণ প্রবণতা চলতে থাকলে খণ্ডিত ভারত যে আবার খণ্ডিত হবে না এমন গ্যারান্টি বোধহয় দেওয়া যায় না। কারণ এখন একদিকে সংখ্যালঘুরা নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়ে সংহত হচ্ছে, অন্য দিকে সংখ্যাগুরুরা আত্মপরিচয়ের নামে গোর্খাল্যান্ড, কামতাপুরের মতো দাবি আদায়ের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক কলহে ব্যস্ত।

মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য গত ৯ এপ্রিল 'মমতা সরকার' ২২০/ এস এম এ এম ই/১২ এই মেমো নম্বরে জারি করা এক নির্দেশিকায় বলেছে ইমামরা মুসলিম সমাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি চালান বলেই নাকি এই ইমাম ভাতার আয়োজন। মমতার ইমামভাতার ঘোষণাকে বৈধ প্রতিপন্ন করার জন্য ১৯৯৩ সালে ইমামদের বেতন নিয়ে সর্বভারতীয় ইমাম সংগঠনের দায়ের করা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হতে পারে। এই বিভ্রান্তি চরমে নিয়ে যাওয়ার জন্য এমনও বলা হতে পারে যে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি কোষাগার থেকে হিন্দু পুরোহিতদের মাসিক বেতন দেওয়া দোষের না হলে ইমামদের ক্ষেত্রে সেই প্রশ্ন উঠছে কেন?

ইতিহাস বলছে ধনসম্পদের লোভে সোমনাথ মন্দির বহুবার লুণ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজ আমলে আইনের মাধ্যমে হিন্দু মন্দির অধিগ্রহণ করে সেই লুণ্ঠনের ধারা অব্যাহত ছিল। স্বাধীন ভারতে সেই একই উদ্দেশ্যে ধনসম্পদে পরিপূর্ণ একমাত্র হিন্দুদের মন্দির 'অধিগ্রহণের জন্য' তৈরি হলো হিন্দু রিলিজিয়াস এন্ড চ্যারিটেবল এনডাউমেন্ট অ্যাক্ট-১৯৫১। মন্দিরের প্রাত্যহিক কাজকর্ম ও পুরোহিতদের মাইনে দিতে সামান্য অংশ খরচ হলেও এই সমস্ত মন্দিরের বিপুল আয়ের বেশির ভাগটাই খরচ হয় মুসলমান-খৃস্টান ধর্মের উন্নয়নসহ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে। এটি ব্যতিক্রম এই জন্যই যে একমাত্র মন্দির ছাড়া মসজিদ বা গির্জার আয় থেকে একটি পয়সাও এদেশে সরকারি কোষাগারে ঢোকে না। যেমন তিরুপতি মন্দিরের বার্ষিক আয় গড়ে তিন হাজার পাঁচশো কোটি টাকা। এর ছিটেফোঁটা অর্থাৎ ১৫ শতাংশ মন্দিরের উন্নয়ন ও পুরোহিতদের বেতনের জন্য রেখে আর বাকি তিন হাজার কোটি টাকা অন্ধ্রপ্রদেশের সাধারণ বাজেটে ঢুকে যায়। অথচ এই অন্ধ্রপ্রদেশের হাজার হাজার মন্দির অর্থাভাবে ধুঁকছে, সংস্কারের অভাবে ভেঙ্গে পড়ছে, হিন্দু পুরোহিতরা দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে কোনও রকমে টিকে আছে। এই প্রসঙ্গে কর্ণাটক সরকারের দেওয়া ১৯৯৭-২০০২ সালের মন্দিরের আয়ব্যয়ের হিসেবে চোখ রাখলে সংখ্যাগুরুরা যে এদেশে ধর্মীয় দিক থেকে কীভাবে শোষিত হচ্ছে তা স্পষ্ট হবে। যে বাংলার ইমামদের জন্য মমতা মাসিক ভাতার আয়োজন করলেন সেই বাংলায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের পুরোহিতরা কেমন আছে তা দেখতে সমাজের দর্পণ সাহিত্যের পাতায় চোখ রাখা যেতে পারে। যেমন তারাশঙ্কর 'অগ্রদানী' গল্পে লিখেছেন, '...চক্রবর্তী-গৃহিণী যাহাকে বলে রূপসী মেয়ে। দারিদ্রের শতমুখি আক্রমণেও সে রূপকে জীর্ণ করিতে পারে নাই— দেহ শীর্ণ, চুল রুক্ষ, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র; তবুও হৈমবতী যেন সত্যিই হৈমবতী।' গল্পের আরেকটি জায়গায় এই ব্রাহ্মণ ঘরণী হৈমবতী ওঁর স্বামীকে বলছেন, 'বাপ যে চামার, লোভী চামারের ছেলে চাষাও হয়েছে সেটুকুও ভাগ্যি মেনো। লেখাপড়া শেখাবার পয়সা নেই, রোগে অষুধ নেই, গায়ে জামা নেই, তবুও মরে না ওরা!...'।

'পথের পাঁচালী'তে অপুর পিতা ব্রাহ্মণ হরিহরের আর্থিক দৈন্যতা বোঝানোর জন্য বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'এবার বাড়ী হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল— বাড়ী থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা— ওর শরীরটা সারবে এখন।' বাংলা সাহিত্যের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে পুরোহিতদের আর্থিক দৈন্যের এরকম হাজারো হৃদয়বিদারক দৃশ্য। সময় বদলেছে, সমাজ পাল্টেছে, বড় বড় প্যান্ডেলে পুজো হচ্ছে, পঁয়ষট্টি বছর হয়ে গেল দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু পুরোহিতদের আর্থিক দৈন্যের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

অর্থাভাবে এরাজ্যের টোলগুলিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। টোলের পণ্ডিতরা না খেয়ে মরছে। মমতা এ রাজ্যে দশ হাজার মাদ্রাসা নিয়ে উৎসাহ দেখালেও টোলের কথা একটি বারের জন্যও মুখে আনছেন না। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে রাজ্যের কর্ণধার হিসেবে মমতার এই একপেশে আচরণ সাম্প্রদায়িক হিংসা দ্বেষ ছাড়া কোনভাবেই সমাজে সুস্থ বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে না। গত ৩৪ বছরে দলীয় সংগঠন দিয়ে বামেরা এ রাজ্যের বারোটা বাজিয়েছে। এখন মমতা সরাসরি সরকারি ক্ষমতা দিয়ে সেই কাজটি করছে। কে যেন বলে ছিল, আমরা হার্মাদ তাড়িয়ে উন্মাদ এনেছি! এখন মনে হচ্ছে কথাটি বোধহয় ঠিকই বলেছে।

কয়লা কেলেঙ্কারি

রাম তেরি কয়লা ময়লা হো গয়া....

এন. সি. দে

সোনিয়া কংগ্রেসের ক্ষমতায়নের অপর নাম দুর্বৃত্তায়ন। মনমোহন সিং নামক এক ন্যুব্জ, কুব্জ, রাজনৈতিক ভিতহীন, তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিতে পরিপুষ্ট এক অর্থনীতিবিদকে সামনে রেখে ১৯৯১ সাল থেকেই বিদেশিনী কংগ্রেস সভানেত্রীর গোপন নির্দেশে কংগ্রেস দেশকে ক্রমশ বিদেশি অর্থনীতির তাঁবেদারে পরিণত করে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির মূল প্রবণতাই হলো তার শিকারে পরিণত হওয়া দেশটিকে তাদের শিল্পের কলোনিতে পরিণত করা। যে কলোনিতে থাকবে না নিজস্ব কোনও শিল্পনীতি, কৃষিনীতি ও আর্থিক বিকাশের পরিকল্পনা; থাকবে না জাতীয় বিবেক, বুদ্ধি, চেতনাসম্পন্ন জাতীয় স্বাভিমান; থাকবে শুধু লাগামহীন আর্থিক দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারিতে মত্ত মন্ত্রী, নেতা ও আমলাবাহিনী এবং তাদের সঙ্গে লিপ্ত বিদেশি শিল্পপতিদের সেবাদাস কিছু দেশীয় বানিয়া পুঁজিপতি, আর থাকবে ক্ষমতা লাভের অপেক্ষায় নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়িরত বিরোধী দল। আর্থিক সংস্কারের নাম করে এই আর্থিক নীতির সূচনা করেছিলেন বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের সেবক ওই অর্থনীতিবিদ মনমোহন সিং, যে অর্থনীতির পোষাকি নাম উদারীকরণ, ছা-পোষা নাম বেসরকারিকরণ; আর বিশ্বায়ন, যার উদ্দেশ্য জাতীয় অর্থনীতিতে নিয়ে আসা দুর্বৃত্তায়ন। মনমোহনজীর দুঃখ রাজ্যগুলিতে অকংগ্রেসী সরকার থাকায় তার এই গেম-প্ল্যানের ষোলকলা পূর্ণ হচ্ছে না। বিদেশি অর্থে পরিপুষ্ট সংবাদপত্র ও চ্যানেলগুলো সংস্কার কর্মসূচী বাজেটে পরিপূর্ণভাবে না থাকায় মনমোহনজীকে লাগাতার সমালোচনা করে চলেছেন। আর্থিক সংস্কারের নাম করে আর্থিক সংস্কারের এই পরিকল্পনা রূপায়িত হবে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে নয়, ওই বিদেশি মহাদানবের কবরে।

এই কথাগুলো বলতে হলো এটা বোঝাতে যে কয়লা কেলেঙ্কারিটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটা একটি বৃহৎ পরিকল্পনার অংশবিশেষ। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ/CAG) তার "Performance Audit of Coal Block Allocations"-এর প্রাথমিক রিপোর্টে বলেছেন, সরকার ১০০টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ১৫৫টি কয়লা সমৃদ্ধ এলাকা (Coal Blocks) ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে নিলাম ছাড়াই দিয়ে দেয়। এর ফলে ১০.৬৭ লক্ষ কোটি টাকার অপ্রাপ্য (undue) সুবিধা তাদের পাইয়ে দেওয়া হয়। এই প্রাপকদের মধ্যে রয়েছে ১০০টি বেসরকারি কোম্পানী এবং সেইসঙ্গে কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ, ইস্পাত ও সিমেন্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানও। কয়েকটি বৃহৎ বেসরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানীর লাভের হিসাব দেওয়া হলো : (সারণী-১ দ্রষ্টব্য)

Times of India পত্রিকায় প্রকাশিত এই হিসাব কোল ব্লক দেওয়ার সময়ের ভিত্তিতে তৈরি। তবে ক্যাগের মতে, ব্লক প্রদানের সময়কালীন হিসাবে ধরলেও এই ক্ষতির পরিমাণ ৬.৩১ লক্ষ কোটি টাকা। তবে ৩১ মার্চ, ২০০১-এর কয়লার মূল্যের হিসাবে ক্যাগের দেওয়া ক্ষতির পরিমাণ ১০,৬৭,৩০৩ কোটি টাকা। এই ক্ষতির পরিমাণ ২-জি স্পেকট্রাম বিতরণের ক্ষতির চেয়ে ৬ গুণ বেশী। ওই ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা। বলে রাখা ভাল কয়লা খাদান গুচ্ছ বিতরণ করে যে ক্ষতির হিসাব ক্যাগ দিয়েছে তা কিন্তু ৯০ শতাংশ মজুত কয়লার হিসাব ধরে করা হয়েছে; তাও আবার সবটাই low-grade কয়লা ধরে নিয়েই হিসাব করা হয়েছে। কোনও কোনও খনিতে high grade বা medium grade কয়লাও তো আছে। অতএব বোঝাই যাচ্ছে ক্যাগ এই হিসাব অত্যন্ত conservative outlook নিয়ে

গড়-দরেই করেছে। ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ক্যাগ বছরভিত্তিক যে হিসাব দিয়েছে তাতে দেওয়ার বছর (Year of allotment) এবং ৩১.৩.২০১১-তে কয়লার দামের ভিত্তিতে ক্ষতির হিসাব দেওয়া হয়েছে। সেই হিসাব দেওয়া হলো (সারণী-২ দ্রষ্টব্য)।

ক্যাগের মতে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বড় বড় কর্পোরেট হাউসগুলিকে যে ভাবে কয়লা ব্লক দেওয়া হয়েছে তা মোটেই স্বচ্ছ নয়; যেমন, টাটা সন্স্ ও দক্ষিণ আফ্রিকার সামোল কোম্পানীর যৌথ উদ্যোগ 'স্ট্যাটেজিক এনার্জি টেক্নোলজি সিস্টেমস'-কে 'নর্থ আরকাপাল কোল ব্লক' এবং জিন্দাল স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার কোম্পানীকে 'রামচণ্ডী প্রমোশনাল ব্লক' দিয়ে দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে ২০০৯-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি, নির্বাচনী কোড অফ কনডাক্ট শুরু হওয়ার ঠিক আগের দিন। ব্লক দুটিতে ছিল এক একটিতে ১৫০০ মিলিয়ন টন করে মজুত কয়লা। এই প্রদান Reliance Industries, Indian oil corp., GMR Group, Lanco Infratech, JSW Energy-র মতো আরও ১৬টি কোম্পানীকে ক্ষুব্ধ করেছিল, কারণ তারাও চেয়েছিল কয়লা থেকে তেল উৎপাদনের পাইলট প্রজেক্ট তৈরি করতে। আবার এই সুবিধাভোগীদের তালিকায় Reliance Power-এর নাম নেই, অথচ এদের দেওয়া হয়েছে 'সাসান এবং তিলাইয়া আল্ট্রা মেগা পাওয়ার প্রজেক্ট' গড়তে ১২টি ব্লক। অন্য একটি বিভাগে অবশ্য দেখানো হয়েছে Reliance Power-কে অপ্রাপ্য সুবিধা দেওয়া হয়েছে ২৫ বছর ব্যাপী ১৫,৮৪৯ কোটি টাকার।

কয়লা ব্লক প্রদান কাজের সঙ্গে যুক্ত আধিকারি করা এখন বলতে শুরু করেছে যে এই প্রক্রিয়াটিকে মোটেই কোনও আর্থিক কেলেঙ্কারি বলা চলে না, কারণ অর্থের বিনিময়ে তো কোনও ব্লক কাউকে দেওয়া হয়নি। কেবল নিজেদের প্রয়োজনে নিজেরা কয়লা তুলে নাও'— এই পলিসিতেই কয়লা ব্লক দেওয়া হয়েছে। কয়লা তোলার পর কেবল রাজ্যগুলিকে রয়্যালটি দিতে হবে। সরকারি আধিকারিকদের এই যুক্তি সামলাতে শোনা যাচ্ছে ক্যাগ তাদের ফাইনাল রিপোর্টে কিছুটা পরিবর্তন করতে চলেছে। তারা 'সরকারি ক্ষতি' কথাটার বদলে হয়ত বলবে 'সুবিধা' দেওয়া হয়েছে। টাকার অঙ্ক বদলাবে না। এসবই বোঝা যাবে বাজেট অধিবেশনের পর সংসদে ফাইনাল রিপোর্ট পেশ হলে।

এখন প্রশ্ন হলো, Natural Resource (প্রাকৃতিক সম্পদ)-তো 'National Resource' (জাতীয় সম্পদ)। ২-জি স্পেকট্রাম মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, জাতীয় সম্পদের উপর রাষ্ট্রের অবশ্যই মালিকানা থাকা উচিত। তাই রাষ্ট্রকে এই মালিকানার অভিভাবক ও ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করতে হবে। ক্যাগের মতে, কয়লা একটি

সারণী—১

	বেসরকারি কোম্পানী	লাভ (কোটি টাকায়)		রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানী	লাভ (কোটি টাকায়)
(১)	স্ট্যাটেজিক এনার্জিটেক সিস্টেম লিমিটেড (এ টাটা সাসোল জেভিসি)	৩৩,০৬০	(১)	এন টি পি সি	৩৫,০২৪
(২)	ইলেকট্রো স্টিল কাস্টিং অ্যান্ড আদারস	২৬,৩২০	(২)	টি এন ই বি/এম এস এম সি এল	২৬,৫৮৪
(৩)	জিন্দাল স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড	২১,২২৬	(৩)	এন টি পি সি	২২,৩০১
(৪)	ভূষণ স্টিল লিমিটেড, জয় বালাজী ইন্ডিয়া অ্যান্ড রেশমি সিমেন্টস	১৫,৯৬৭	(৪)	জে এস ই বি অ্যান্ড বি এস এম ডি সি	১৮,৬৪৮
(৫)	রাম স্বরূপ লোধ উদ্যোগ, আধুনিক কর্পোরেশন উত্তম গালভা স্টিল অ্যান্ড হাওড়া গ্যাসেস, বিকাশ মেটালস পাওয়া অ্যান্ড এ সি সি	১৫,৬৩৩	(৫)	এম এম টি সি	১৮,৬২৮
(৬)	জে এস পি এল অ্যান্ড গগন স্পঞ্জ আয়রন লিমিটেড	১২,৭৬৭	(৬)	ডব্লিউ বি পি ডি সি এল	১৭,৩৫৮
(৭)	এম সি এল/জে এস ডব্লিউ/জে পি এল/ জিন্দাল স্টেনলেস/শ্যাম ডি আর আই	১০,৪১৯	(৭)	সি এম ডি সি	১৬,৪৯৮
(৮)	টাটা স্টিল লিমিটেড	৭,১৬১	(৮)	এম এস ই বি অ্যান্ড জি এস ই সি এল	১৫,৩৩৫
(৯)	ছত্তিশগড় ক্যাপটিভ কোল কোম্পানী লিমিটেড	৭,০২৩	(৯)	জে এস এম ডি সি এল	১১,৯৮৮
(১০)	সি ই এস সি লিমিটেড অ্যান্ড জে এ এস ইনফ্রাস্ট্রাকচার	৬,৮৫১	(১০)	এম পি এস এম সি এল	৯,৯৪৭

সূত্র : টাইমস অফ ইন্ডিয়া

প্রাকৃতিক সম্পদ; তাই এর হস্তান্তর প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই হওয়া উচিত যাতে এতে স্বচ্ছতা থাকে। বেসরকারি কোম্পানীগুলো জাতীয় সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারে তবে তাদের উদ্দেশ্য হবে জনস্বার্থ এবং তা করতে হবে পরিচ্ছন্ন ও যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি মেনে। জাতীয় সম্পদ সঠিক হোত। ক্যাগ তার রিপোর্টের এক জায়গায় লিখেছে— কয়লা খনিগুচ্ছ ২০০৪ সালের ২৮ জুন যখন প্রদান করার কাজ শুরু হয় তখন তা প্রতিযোগী দরের ভিত্তিতে দেওয়ার পলিসি গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু নানান অজুহাতে তা পিছোতে পিছোতে ৭ দিকে তাকিয়ে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কি সেই সম্পদ ব্যবহৃত হবে? বাস্তব অবস্থা কিন্তু তা বলে না Central Electricity Regulatory Commission (CERC) বিদ্যুৎ শুল্ক নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু বেসরকারি নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি এই নিয়ন্ত্রণবিধির আয়ত্তাধীন নয়, তাহলে! বিনি পয়সায় কয়লা খনি নিয়ে বিদ্যুৎ

সারণী—২

প্রদান বছর	কয়লার পরিমাণ (মিলিয়ন টনে)	কয়লার দামের ভিত্তিতে যত পাইয়ে দেওয়া হয়েছে	
		প্রদান বছরে (কোটি টাকায়)	৩১.৩.২০১১-তে (কোটিতে)
২০০৪	১,৭০৯	৪৫,০৮৭	৫৬,৯৪৯
২০০৫	৩,১৬৩	৭৩,২০৩	১,৩১,০৮৪
২০০৬	১১,৬৭১	২,৪৭,২০৪	৩,৭১,৩১১
২০০৭	৮,৭৪৬	১,০২,৩৫০	২,৫৮,৫৯৯
২০০৮	২,৯৭০	৬১,১৪৯	৮৭,৫০১
২০০৯	৪,৯০৮	১,০২,১৭৪	১,৬১,৮৫৯
মোট	৩৩,১৬৭	৬,৩১,১৬৭	১০,৬৭,৩০৩

জনগণের সম্পদ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনগণের, জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা গঠিত। রাষ্ট্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। জনগণই রাষ্ট্র বা সরকারকে নিয়োগ করে তাদের সম্পদ রক্ষা করতে। সরকার রক্ষক, ভক্ষক নয়। সরকার তাই জনগণের সম্পদ লুঠেরাদের হাতে বিলিয়ে দিতে পারে না। সরকারকে এই সম্পদ বেসরকারি হাতে অর্পণ করার আগে নিশ্চিত করতে হবে যাতে এই সম্পদ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য জনগণ অলাভজনক কম দামে পায় ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য।

ক্যাগ, কয়লা মন্ত্রক, কর্পোরেট হাউস এমনভাব দেখাতে শুরু করেছে যেন কয়লা খনি নিলামের মাধ্যমে বিলি করলেই সেটো বছরেরও বেশি সময় বয়ে গেছে কার্যকরি হতে। টাটা সনসও বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে রতন টাটার নেতৃত্বাধীন 'ইনভেস্টমেন্ট কমিশন' আগেই কয়লা খনিগুচ্ছ নিলামে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, যেমনটি করা হয়েছিল তেল ও গ্যাস উত্তোলনের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে। কিন্তু কার অঙ্গুলিহেলনে এইভাবে কয়লার মতো ক্রমহ্রাসমান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদকে লুণ্ঠন করার সহজ পথ গ্রহণ করা হলো?

পরিশেষে এ আশঙ্কা করা যেতেই পারে যে জাতীয় সম্পদ নিলামে অর্থের বিনিময়ে দিলেও বেসরকারি মুনাফাবাজদের হাতে তা কি সুরক্ষিত থাকতে পারে? জনগণের স্বার্থের উৎপাদনকারী এই কেন্দ্রগুলি কী জনগণের স্বার্থে বাণিজ্য না করে অল্প দামে বিদ্যুৎ বিক্রি করবে?

মনে হয় না। বিনি পয়সায় কয়লা খনি পেয়ে যারা ইস্পাত ও সিমেন্ট কারখানা গড়ছে তাদের ক্ষেত্রেই এই আশঙ্কা অমূলক নয়। তারাও কী অল্পদামে ইস্পাত ও সিমেন্ট জনগণের হাতে তুলে দেবে? ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে তো ভয় পাবেই। এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৫৫টি ব্লকে যে ৩৩,১৬৯ মিলিয়ন টন কয়লা বিলিয়ে দেওয়া হলো তা দিয়ে ১,৫০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করা চলতে পারে ৫০ বছর ধরে। দেশের বর্তমান প্রয়োজনও তাই।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ন। মাত্র দুই মিনিটে ৈর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর, ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 15, College Street, Kolkata-700012
Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

প্রধানমন্ত্রীর সততা প্রশ্নের মুখে

ইউ পি এ সরকারের কয়লা-কেলেঙ্কারী

বাসুদেব পাল

সোনিয়া-মনমোহন নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের একের পর এক দুর্নীতি ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে আর সরকার নিজেকে বাঁচাবার জন্য রক্ষণাত্মক নীতি গ্রহণ করছে। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (CAG)-এর খসড়া রিপোর্টে এবার কেবল কয়লা বিভাগে এ পর্যন্ত সর্বাধিক দশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম বা সরকারের লোকসানের বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। সংসদে বিষয়টা নিয়ে বিরোধী দলের সাংসদরা হৈচৈ করতেই প্রধানমন্ত্রী এবং 'পি এম ও' অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ক্যাগের রিপোর্টটিকে 'খসড়া' বলে নিজেদের বাঁচাতে উঠে পড়ে লেগেছে। যেহেতু 'খসড়া' অন্তিম বা চূড়ান্ত নয়। কিন্তু বাস্তবে খসড়াকে ভিত্তি করেই চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করা হয়— এটা যে কোনও স্বল্প-শিক্ষিত ব্যক্তিও জানেন।

গত ২২ মার্চ একটি ইংরেজী দৈনিকে খসড়া রিপোর্টের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। সেইমতো বলা হয়েছে সরকার যাবতীয় নীতি নিয়মকে তাকে তুলে রেখে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিভিন্ন কোম্পানীকে কয়লাখনি বন্টন করাতেই এই বিশাল অঙ্কের লোকসান হয়েছে। বর্তমান কয়লামন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়াল তাঁর আমলে এই দুর্নীতি হয়নি বলে গায়ে লাগা কয়লার ধুলো ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছেন। এদিকে ওইদিন (২২ মার্চ) কেন্দ্র-সরকারের নিঃশর্ত সমর্থনকারী মুলায়মের সমাজবাদী পার্টি, বিরোধী বিজেপি-শিবসেনা সহ বিভিন্ন দলের নেতারা একযোগে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করে বসেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে পেট্রোলিয়ামের পর একমাত্র কয়লাই বিদ্যুতের চাহিদার জন্য উপকরণ হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। দেশের ৫৫ শতাংশ বিদ্যুতের চাহিদা কয়লা থেকেই আসে। শিল্প-কারখানাও অনেকাংশে কয়লার উপর নির্ভরশীল।

ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কয়লা উৎপাদনের ইতিহাস বেশ পুরাতন। প্রায় ২২০ বছরের। পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদীর পশ্চিম তীরে ১৭৭৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদপ্রাপ্ত "মেসার্স সুমনের এবং হিটলি" রাণীগঞ্জ কোল্ডফিল্ডে কয়লা তোলা শুরু করে। প্রথমদিকে প্রায় একশ বছর কয়লার বাজার মন্দা ছিল। চাহিদা বিশেষ ছিল না। ১৮৫৩ সালে প্রথম রেল চালু হলে কয়লার বাজার ক্রমশ চাঙ্গা হয়। উৎপাদন বেড়ে বার্ষিক এক মিলিয়ন টনে পৌঁছায়। বর্তমানে চিত্রটা পুরো পালটে গিয়েছে। এক সমীক্ষা অনুসারে ভারতবর্ষে মাটির নীচে মজুত কয়লার পরিমাণ আনুমানিক ২৫৩.৩০ বিলিয়ন টন। ১৯৭০ সালে কয়লা ক্ষেত্রকে জাতীয়করণ করা হয়। সে বছর বার্ষিক উৎপাদন হয় ৭০ মিলিয়ন টন। ২০০৩-০৪-এ বার্ষিক উৎপাদন ছিল ৩৫৫ মিলিয়ন টন।

বিশেষজ্ঞদের মতে পেট্রোলিয়ামের পর একমাত্র কয়লাই বিদ্যুতের চাহিদার জন্য উপকরণ হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। দেশের ৫৫ শতাংশ বিদ্যুতের চাহিদা কয়লা থেকেই আসে। শিল্প-কারখানাও অনেকাংশে কয়লার উপর নির্ভরশীল। ভারতের ২৭টি প্রধান কয়লাখনি অঞ্চল দেশের পূর্ব, মধ্য এবং দক্ষিণ ভাগে রয়েছে। ক্যাগ-এর (CAG) খসড়া রিপোর্ট অনুসারে ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে ৩৩ হাজার ১৬৯ মিলিয়ন টন কয়লা বেআইনীভাবে খনন করা হয়েছে। এই

পরিমাণ কয়লা দিয়ে ৫০ বছরের কয়লার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হোত।

গত ১৬ মার্চ কেন্দ্র সরকার সংসদে বাজেট পেশ করেছে— আগামী অর্থবছরে বাৎসরিক বরাদ্দ মোট ১৪ লক্ষ কোটি টাকা। এই কয়লা নিয়ে বিশাল পরিমাণে আর্থিক দুর্নীতিই বলে দিচ্ছে সরকারের কোষাগার কীভাবে খালি হচ্ছে। আর তা পূরণ করতে সরকারকে নানাধরনের কর বসাতে হচ্ছে। এই বোঝাটা চাপছে জনসাধারণের উপরে। ২-জি এবং কয়লা খনি বন্টনে স্বচ্ছ নীলাম প্রক্রিয়া গ্রহণ করলে প্রায় ১৩ লক্ষ কোটি টাকা সরকারের কোষাগারে আসত।

কয়লার উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। বাংলাদেশ, ভূটান এবং নেপালে ভারতীয় কয়লার বাজার এবং চাহিদা রয়েছে। কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড কয়লা রপ্তানি করে থাকে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ভারত ৩৫,৮৩১ টন কয়লা রপ্তানি করেছে। ১৫৫ বর্গ একর কয়লাখনির একশটিরও বেশি খনি ব্যক্তিগত এবং সরকারি কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে। সরকার খারাপ ও বাজে শ্রেণীর দামে খনি বন্টন করেছে। আর সেখান থেকে সকলে উৎকৃষ্ট মানের কয়লা উত্তোলন করেছে। ওইসব কোম্পানী স্টীল, বিদ্যুৎ এবং সিমেন্ট উৎপাদন করে থাকে।

সরকারি কোম্পানীকে কমদামে বন্টনের কারণে ক্ষতির পরিমাণ ৫.৮৮ লক্ষ কোটি টাকা। আর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানীকে দেওয়াতে ক্ষতির পরিমাণ ৪.৭৯ লক্ষ কোটি টাকা।

একটি ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে ক্যাগ (CAG) কয়লা-কেলেঙ্কারিকে এ পর্যন্ত সর্বাধিক পরিমাণে আর্থিক দুর্নীতি বলে আখ্যায়িত করেছে। যা ২-জি স্পেকট্রাম দুর্নীতির তুলনায় প্রায় ছয় গুণ বেশি। স্বভাবতই, খবর প্রকাশিত হতেই প্রধানমন্ত্রীর সততা প্রশ্নের সম্মুখীন। ২০০৪—২০০৯-এর সময়ে শিবু সোরেন কয়লামন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ওই সময়ে শিবু সোরেনের ইস্তফার পর প্রায় দেড় বছর কয়লা মন্ত্রক স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর অধীনেই ছিল। এরমধ্যে সি এ জি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট প্রাথমিক খসড়া মাত্র। চূড়ান্ত নয়। ওই চিঠি দেখিয়েই ইউপিএ সরকার কয়লার কালি ধুয়ে ফেলতে চাইছে। সি এ জি রিপোর্ট লিক্ হওয়াটাও লজ্জাকর। এ নিয়ে কয়েকদিন রাজধানীর রাজনীতি সরগরম ছিল। ইউ পি এ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীকে স্বয়ং ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামতে হয়েছে। তবে সংসদীয় কার্যমন্ত্রী রাজীব শুক্লা বলেছেন— 'ঘোটালা' নয় ঘাটা (অর্থাৎ দুর্নীতি নয়, লোকসান) হয়েছে।

একথাই প্রাথমিক ক্যাগ রিপোর্টের সত্যতার পক্ষে বড় প্রমাণ।

প্রাইভেট কোম্পানীর নাম	পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং
* স্ট্র্যাটেজিক এনার্জি টেক	* এন টি পি সি
* ইলেকট্রো স্টীল কাস্টিং অ্যান্ড আদার্স	* টি এন ই বি
* জিন্দল স্টীল অ্যান্ড পাওয়ার	* এম এস এম সি এল
* ভূষণ স্টীল	* জে এস ই বি
* জয় বালাজী ইন্ডাস্ট্রিজ	* বি এস এম ডি সি
* রশ্মি ইন্ডাস্ট্রিজ	* এম এম টি সি
* রাম স্বরূপ লৌহ	* ডব্লিউ বি পি ডি সি এল
* আধুনিক কোং	* সি এম সি ডি
* উত্তম গল্লা স্টীল	* এম এস ই বি এবং জে এস ই সি এল
* হোবরান গ্যাসেজ	* জে এস এম ডি সি এল
* বিকাশ মেটালস্ পাওয়ার	* এম পি এস এম সি এল
* এ সি সি	
* জে এস পি এস	
* গগন স্পঞ্জ	
* এম সি এল	
* জিন্দল স্টেনলেস	
* টাটা স্টীল	

নোট বুকের রাইটার চাই

নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ডিগ্রিকোর্স (কল্যাণী, গৌড়, বর্ধমান) ও চাকুরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাজেশন ভিত্তিক বই লেখার জন্য রাইটার চাই। যোগ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। নাম ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে শীঘ্র এস. এম. এস. করুন।

৯৮৩২০৪৩৫১৫, ৯৭৩৫৯৪৮৭৯০

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

তিব্বতে শান্তি প্রক্রিয়া

তিব্বতে চীনের দখলদারি ও শাসনের বিরুদ্ধে তিব্বতীদের প্রতিবাদী আন্দোলন দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি চীনা প্রেসিডেন্ট হু জিনতাওয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষে ভারত সফরকে কেন্দ্র করেও তাদের প্রবল অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে দিল্লীর সংসদ ভবনের সামনে। কয়েকশো তিব্বতী চীনা প্রেসিডেন্টের ভারত সফরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সময় এক তিব্বতী যুবক গায়ে

এক তিব্বতীর গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা।

আগুন দিয়ে আত্মাহুতির চেষ্টা করেন। এই ভয়াবহ ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত সকলেই হতচকিত হয়ে যান। অবশ্য চীনা শাসনের বিরুদ্ধে তিব্বতে এধরনের আত্মাহুতির ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। বস্তুত শুধু তিব্বত নয়, চীন, ভারতের অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম রাজ্যকে নিজেদের দখলে রাখার চক্রান্ত করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এমনকি চীনের তৈরি করা মানচিত্রে জম্মু ও কাশ্মীরকে পৃথক করে দেখানো হয়। অর্থাৎ চীনের আগ্রাসী মানসিকতায় উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গভীর উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। তবে তিব্বতকে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার ফিরিয়ে না দিয়ে চীন যে সার্বভৌম কর্তৃত্ব কায়েম রেখেছে তাতে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেও একটা অশনি সংকেতের বার্তা বহন করে। এই চীনই ১৯৫০ সালে ভয়ংকর হত্যালীলার মাধ্যমে তিব্বত দখল করেছিল। সেই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের কথা তিব্বতীরা কোনওদিন ভুলতে পারেননি। এর ফলেই তিব্বতে আত্মাহুতির ঘটনা দীর্ঘদিন ধরেই ঘটে চলেছে। তাই দিল্লীর সংসদ ভবনের সামনে তিব্বতীর আত্মাহুতির ঘটনায় অস্বাভাবিকতা নেই। অথচ চীন এই প্রতিবাদী আন্দোলনকে স্বীকার করে না। অবশ্য এর নেপথ্যে কৌশলগত কারণ আছে। তবুও এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে গেলে তিব্বতকে চীনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন তিব্বতীদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, তিব্বতীরা কোনোদিন চীনের একচ্ছত্র আধিপত্যকে স্বীকার করেনি। তিব্বতীরা তিব্বতকে একটা সার্বভৌম স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে গণ্য করতে চায়। সমগ্র বিশ্ব তথা রাষ্ট্রসংঘেরও এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। তিব্বতকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

চিঠিপত্র

ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ

গত ১৯ মার্চ কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজী দৈনিকে ছোট্ট একটি ছবি প্রকাশিত হয়। তাতে এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ মানুষ সেই দিন রাত থেকে পরদিন বিকাল পর্যন্ত শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে তাণ্ডব চালায় তাকে ১৯৪৬-এর 'ডাইরেক্ট অ্যাকসন ডে'-এর মহড়া বললেও অত্যুক্তি হয় না। পুলিশ ও প্রশাসন ছিল নির্বিকার।

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করা গেছে যে কোথাও কোনও একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে তাণ্ডব চালায়। কোটি কোটি টাকার সরকারি এবং সাধারণ লোকের সম্পত্তি ধ্বংস করে। এখানে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক—(১) গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর মধ্যে ঢোকার পথে একটি সরকারি বাস জনৈক মহম্মদ সাকিলকে ধাক্কা মারে। ফলে সাকিলের মৃত্যু হয়, এরপর তার সম্প্রদায়ের লোকেরা ট্রাম ডিপোতে ঢুকে ৪৬টা বাস, ১১টা গাড়ী এবং ২টা ট্রাম ভেঙ্গে তছনচ করে দেয়। এর পুরস্কার স্বরূপ পরিবহণ মন্ত্রী নিহতের বাড়ী গিয়ে ৫০ হাজার নগদ টাকা এবং পরিবারের একজনকে সরকারি চাকুরীর প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন। (২) কয়েক মাস আগের ঘটনা ভি আই পি রোডে উক্ত সম্প্রদায়ের জনৈক পথচারী গাড়ী চাপা পড়ে মারা যান, ঘটনার ১ ঘণ্টা পরে তার গ্রামে খবর গেলে মসজিদ থেকে মাইক মারফত আওয়াজ ফুঁকিয়ে দিলে গ্রাম থেকে কিছু যুবক ম্যাটাডোর ভ্যানে এসে প্রাইভেট গাড়ীগুলিতে যথেচ্ছ ভাঙ্গচুর চালায়, ওই গাড়ীগুলির মালিকরা কেউই ওই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী নয়। (৩) কিছুদিন আগে উত্তর ২৪ পরগণার এক গ্রামে বে-আইনী বিদ্যুৎ চুরির হুকিং বন্ধ করতে গেলে গ্রামবাসীদের আক্রমণে একজন হোমগার্ডের মৃত্যু হয়, পুলিশের গাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বহু পুলিশ কর্মী এবং বিদ্যুৎ কর্মী মার খেয়ে পালিয়ে বাঁচেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে পুলিশকে বেশী বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ দেন। মাত্র একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। (৪) তসলিমা বিতাড়নের উদ্দেশ্যে শহরে ২০০৯-এ যে তাণ্ডব চলে তা সর্বজনবিদিত, ওইদিন কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি এবং গাড়ী ধ্বংস হয়। (৫) আর একটা ব্যাপার এখানে লক্ষণীয়। কোনও মুসলমান মহিলা ধর্ষিতা হলে তারা আশাতীত ক্ষতিপূরণ পান, ফুলবাগানের ফুটপাথবাসিনী নাহার বাণু ধর্ষিতা হয়ে একটি সরকারি চাকুরী পেয়েছেন। সঙ্গে থাকবার জন্য একটি কোয়ার্টার। ধর্ষক নীলু ঘোষ যাবৎজীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে। বাংলা দেশের জনৈকা আওয়ামী লিগ কর্মী এদেশে এসে হাওড়া স্টেশনে দালালদের মারফত আজমির শরীফ যাওয়ার টিকিট কাটতে গিয়ে ধর্ষিতা হন। মহামান্য আদালত রেল কোম্পানীকে ১২ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরণ দিতে নির্দেশ দেন, ১২ লক্ষ টাকা নিয়ে তিনি বাংলাদেশে পাড়ি দেন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গলার শিরা ফুলিয়ে ইনসাল্লা ইনসাল্লা বলে লোককে রবীন্দ্রনাথ নজরুলের বাংলার ঐতিহ্য শোনাচ্ছেন। কলকাতা নাকি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পীঠস্থান, তাঁকে ১৬ আগস্ট ১৯৪৬-এর দিনটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যাতে ২০ হাজার লোক খুন হয়েছে, সম্পত্তি ধ্বংস এবং লুট হয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকার। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদেরকে বলছি ঝড়জলে উঠপাখীর মতো বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা না করে পশ্চিমবঙ্গ কী ভয়াবহ অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে তা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হোন। আর একটা বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। মুসলমানদের মধ্যে অনেক আই এ এস, আই পি এস, অধ্যাপক, ডাক্তার, আইনজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী আছেন, তাঁরা এই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দেখেও একেবারে নির্বিকার কেন? তাহলে কি ধরে নেব তাঁরাও এইসব ধ্বংসাত্মক কাজের সমর্থক?

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪।

রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদীর বিদায়

রণজিৎ সিংহ

শেষ পর্যন্ত নানা ঘটনার চাপে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তাঁর এই দুর্ভাগ্যজনক, অকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে চলে যাওয়ার বিষয়টি দেশের নাগরিক তথা গণতান্ত্রিক ভাবনা-চিন্তার চর্চা ও অনুসারীদের বিশেষভাবে ভাবিত করেছে। মনে হয় ছোট্ট পরিসরে মন্ত্রীমহোদয়ের এই পদত্যাগ-কাণ্ডটি বিচার-বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী।

আমরা সবাই জানি গণতান্ত্রিক কাঠামোতে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশে। তাই এখানে যোগ্যতা থাকলেও কোন্ জনপ্রতিনিধি মন্ত্রী হবেন, এমন কোনও লিখিত বা অলিখিত নির্দেশ বা কথা নেই। তাই দলের কোনও সদস্যের মন্ত্রী হওয়া 'সৌভাগ্য' ছাড়া অন্য কিছু নয়! কিন্তু দীনেশ ত্রিবেদীর ক্ষেত্রে ঘটনা ভিন্ন। দলের নির্দেশেই তিনি কেন্দ্রের জোট মন্ত্রিসভায় রেল দপ্তরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছিলেন। যোগ্যতার সঙ্গে এত বড় দপ্তরের দায়িত্ব পালন করছিলেন। সমালোচনা থাকলেও গ্রহণযোগ্য, ব্যাপক রেলবাজেট দেশবাসীর সামনে রেখেছিলেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই বাজেটের প্রশংসায় মুখর ছিলেন। সেখানে নিজ দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের 'সংকীর্ণ', 'আত্মম্ভরী' মনোভাবের কাছে রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন! এই ঘটনা দেশবাসীর কাছে চরম দুর্ভাগ্য।

আবার এই 'দুর্ঘটনা' বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই কারণে যে, ভারত তথা গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় একজন মন্ত্রী তাঁর দপ্তরের বাজেট সুষ্ঠু, সুন্দরভাবে উত্থাপন করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতিরও সামান্য অভিযোগ নেই, অথচ দলের একদেশদর্শী সংকীর্ণ সর্বোচ্চ নেতৃত্বের 'মানভঞ্জনের' জন্য মাননীয় ত্রিবেদীকে মন্ত্রিসভা থেকে সরে যেতে হলো! বাজেটে উত্থাপিত রেল ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে তাঁর আনা সুপারিশগুলোর সদস্যদের সমালোচনার উত্তর দেবার সুযোগও পেলেন না! তাই তাঁর মানসিক যন্ত্রণা সহজেই বোধগম্য।

এই পদত্যাগ ঘটনাটি আরেকটি দিক্ আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক মানুষের মান-সম্মান আছে প্রতিষ্ঠান ও সমাজগত ভাবে। সেখানে মাননীয় ত্রিবেদীকে যেভাবে চলে যেতে হলো, সেখানে সাধারণ ব্যবহারের এই সকল মাপকাঠির কোনও মান্যতাই দেওয়া হলো না! Humiliation বা চরম অপমানের এক জঘন্য দৃষ্টান্ত হয়ে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিলেন!

গণতান্ত্রিক আইনসভার একটি বৈশিষ্ট্য— যিনি বাজেট পেশ করেন, সেই মন্ত্রীই তাঁর দপ্তরের বাজেট সমালোচনার উত্তর দিয়ে থাকেন। মাননীয় দীনেশ ত্রিবেদী সে সুযোগ পাননি! এই ঘটনা তাঁর ও দেশবাসীর কাছে একটি অশুভবার্তা। লোকসভার ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট আইনবেত্তা সোমনাথ চ্যাটার্জি যথার্থই বলেছেন, 'একজন রেলমন্ত্রী বাজেট পেশ করছেন, অন্য একজন রেলমন্ত্রী জবাবি ভাষণ দিচ্ছেন। এই ঘটনা ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে সদর্থক অধ্যায় নয়!'

রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী চলে গেছেন। নিজ দপ্তরের বাজেট পেশ করার পর যে অপমান, গঞ্জনা তাঁকে সহ্য করতে হলো নিজের দলের থেকে, তাতে আগামী দিনে তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্রমের প্রতি আমাদের ঔৎসুক্য রইল। রেল দপ্তর যে একজন যোগ্য ব্যক্তির পরিচালনায় ছিল, সেই স্বীকৃতি প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনোমোহন সিংহ দিয়েছেন অকুণ্ঠিতভাবে। পরিস্থিতির চাপে তিনি রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলেছেন তাঁর প্রিয় সহকর্মীর এই আকস্মিক বিদায়ে তিনি গভীরভাবে 'দুঃখিত।' প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর এই মর্মবেদনা রেলমন্ত্রীর এই আকস্মিক বিদায়-পর্বকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এই ঘটনাটি চিরকালই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখিত হবে। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় 'দল' ও 'দেশ' বলে দুটো বিষয় থাকে। 'দেশ' নিশ্চিত 'দলের' ওপরে। কিন্তু এই ঘটনা আমাদের দেখিয়ে ছিল 'দলের' স্থান 'দেশের' ওপরে। ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে এটি একটি বিপজ্জনক প্রবণতা।

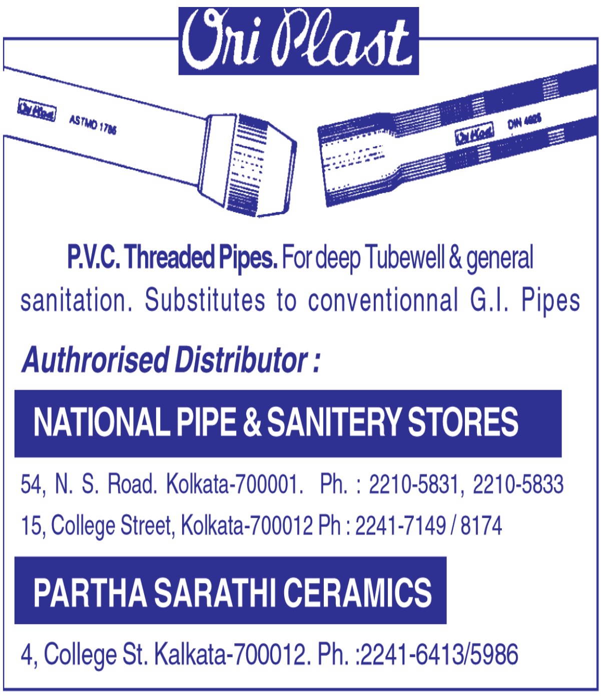

সন্ন্যাসী হওয়ার পরীক্ষা

সেবার কাজে ব্রতী হয়ে পাঁচজন তরতাজা তরুণ ঠিক করল সন্ন্যাস নেবে। ঘরদোর ছেড়ে যেতে হবে। চাকরি-বাকরি করছিল, তাও ছাড়তে রাজি। আরও অনেক কিছু ছাড়ার জন্যে তারা তৈরি। যে সন্ন্যাসীর কথাবার্তা শুনে তাদের মনে দোলা লেগেছিল, মন উদাস হয়েছিল তাঁর নাম স্বামী শান্তিস্বরূপ। তিনি বললেন, 'সন্ন্যাসী হওয়ার স্বাধীনতা তোমাদের আছে। কিন্তু অনেকগুলো পরীক্ষার স্তর পেরোতে হবে। যদি পেরোতে পারো তাহলে সন্ন্যাসী হতে পারবে। পেরোতে না পারলে সংসারে ফিরে যেতে হবে। এবং বোঝা দরকার সন্ন্যাসী হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।'

পাঁচজন তরুণের নাম জয়ন্ত, সুশান্ত, প্রশান্ত, তরুণ, অরুণ। ওরা প্রায় সমবয়সী। মজবুত গঠন। কিন্তু মানসিক গঠন কার কেমন তারই পরীক্ষা নিতে চান সহজ ভঙ্গিতে। সন্ন্যাসী হওয়ার আগে এঁদেরও অনেক পরীক্ষা দিতে হয়েছিল! গৃহী মানুষের যেমন অনেক রকম দায়িত্ব আর পিছুটান থেকে যায়, তেমনি সন্ন্যাসীর থাকে অনেকরকম বন্ধন। যা এড়ানো যাবে না। পেরোতে হবে।

পাঁচজন তরুণ বেরিয়ে পড়ল বিভিন্ন দিকে। প্রত্যেককে আলাদাভাবে চলতে হবে। কারও সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ থাকবে না। শান্তিস্বরূপ প্রত্যেককে দিয়েছিলেন দু'প্রস্থ করে পাঞ্জাবী, ধুতি, চাদর, কম্বল, কিছু শুকনো খাবার। আর প্রত্যেকের জন্যে পাঁচশো করে টাকা। সকলের কাঁধে ঝুলি। হাতে ছ-ফুট লম্বা পাকা বাঁশের লাঠি। শান্তিস্বরূপ বললেন, 'পনেরো দিনের মধ্যে তোমরা ফিরে আসবে।'

পাঁচ তরুণ বেরিয়ে পড়ল পাঁচ পথে। সুশান্ত একটু চলার পর এক গাছতলায় বসে ঝুলি থেকে খাবার বের করে খেলো। সবটা নয়, কিছুটা। জল খেল। তারপর ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। জয়ন্ত অনেকদূর যাওয়ার পর একটা পুকুর দেখে স্নান করল। স্নানের পর খিদে পায়। সঙ্গের খাবার খেলো। আরাম করে শুলো এক বাড়ির বারান্দায়। তরুণ খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে হাঁটল বহুদূর। জল তেষ্টা পেতে অনেকটা জল খেয়েছিল। অরুণ এক দোকান থেকে কিনে পেট ঠেসে খেলো নানারকম সুস্বাদু খাবার। প্রশান্ত চলতে চলতে থমকে গেলো এক জায়গায়। তিনটে শিশু খিদেয় ছটফট করছে। কাঁদছে। তাদের বাবা নেই, মা বলছে, 'আজ ঘরে কিছু নেই। কি দেব খেতে?' প্রশান্ত এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ক'দিন তোমরা কিছু খাওনি?' শিশুদের মা বলল, 'দু'দিন।' প্রশান্ত ব্যাগ থেকে সব খাবার বের করে বলল, 'এটা আপাতত খাও তোমরা। আর কিছু টাকা দিয়ে যাচ্ছি চাল আলু ডাল তেল কিনে নিও।'

প্রশান্ত হাঁটা শুরু করল আবার। একটু জল খেয়ে নিলো। এক জায়গায় দেখল তিনজন মহিলা পুজো দিতে এসেছে। পুজোর শেষে এক ব্রাহ্মণকে খাওয়াতে চায়। ব্রাহ্মণ না হলেও ক্ষুধার্ত মানুষকে। প্রশান্তকে দেখে তাদের ভালো লাগল। প্রণাম করতে চাইল। প্রশান্ত সরে গেলো। বলল, 'আমি প্রণামের যোগ্য হতে পারিনি এখনও।' তার কথা শুনে মহিলারা খুশি। তারা খাওয়াতে চায়। প্রশান্ত রাজি হলো। সেইসঙ্গে বলল, 'আমার যেটুকু প্রয়োজন খাবো। বাকি খাবার গরিবদের দিয়ে দিন।' মহিলারা বলল, 'তাই করবো মহারাজ।' তারা ভোজন দক্ষিণা দিতে চায়। প্রশান্ত বলল, 'ওই টাকা কোনও ভালো কাজে লাগাবেন। কয়েকটা গাছ কিনে রাস্তার ধারে লাগাতে পারেন।'

সুশান্ত এক জায়গায় গিয়ে চারশো টাকা বাড়ির ঠিকানায় পাঠাল। জয়ন্ত ঝুলির খাবার খেল। তরুণ সন্ধ্যের মুখে এক বাড়িতে আশ্রয় নিল। বাড়ির লোক বলল, যতদিন খুশি থাকুন। অরুণও এক বাড়িতে আশ্রয় পেল। সুশান্ত জয়ন্তও থাকার জায়গা করে নিয়েছে। প্রশান্ত এক জায়গায় দেখল সান্ধ্যক্লাসে বয়স্কদের লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে। যে শেখাচ্ছিল তার আগ্রহ আছে কিন্তু ঠিকমতো বোঝাতে পারছিল না। প্রশান্ত বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন আমি একটু সাহায্য করবো।' শিক্ষক জিজ্ঞেস করল, 'আপনার পরিচয়?' প্রশান্ত বলল, 'আমি একজন পথিক।' শিক্ষক বলল, 'আপনি পড়ান। তবে রাতে আমাদের বাড়িতে থাকবেন।' প্রশান্ত রাজি হয়ে পড়াতে শুরু করল। গল্পচ্ছলে অনেক কিছু শিখিয়ে দিল। সকলে খুশি। গ্রামে সাড়া পড়ে গেল। সেই শিক্ষকের বাড়িতে গেলো। বাড়ির কর্তা বললেন, 'আমরা নিচু জাত। যদি রাজি থাকেন রান্না খাবার খাওয়ার জন্যে বলবো। নয়তো আপনাকে রেঁধে নিতে হবে।' প্রশান্ত বলল, 'কোনও প্রয়োজন নেই। আমি সামান্য খাই। সাধারণ খাবার খাই। আপনারা যা রাঁধবেন তাই-ই খাবো।' পথ চলার ক্লান্তিতে রাতে বেশ ঘুম এসে গেলো তাড়াতাড়ি। ভোরে উঠে ধ্যান ব্যায়ামের পর প্রশান্ত বেরিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি। গ্রামের অনেক মানুষ হাজির। তাদের অনুরোধ এই পিছিয়ে পড়া গ্রামের জন্যে প্রশান্ত কিছু করুক। প্রশান্ত বলল, 'কারও বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়। আর চোদ্দদিনের মধ্যে আমাকে চলে যেতে হবে।' গ্রামের মানুষ তাতে রাজি। গ্রামের আটচালার পাশে একটা ঘর আছে সেখানে থাকার ব্যবস্থা হলো প্রশান্তর। সকালের খাওয়া এক বাড়িতে, রাতের খাওয়া আরেকবাড়ি। সারাদিন গ্রামের জন্যে কাজ। একটা সাইকেল চালিয়ে গ্রামের চারদিক ঘোরে। পাশাপাশি সাইকেল চালিয়ে সব চিনিয়ে দেয় দু'তিনজন উৎসাহী তরুণ। সরকারি কোন কোন সাহায্য গ্রাম পেতে পারে তার জন্য যথাস্থানে আবেদন পত্র লিখে দিলো। সাড়া মিলল। সারাদিনই প্রশান্ত ব্যস্ত। রাতে অভিজ্ঞতার কথা লেখে।

সুশান্ত, জয়ন্ত, তরুণ, অরুণ নানা জায়গায় ঘুরছে। পয়সা খরচ হয়ে গেছে। সুশান্ত কিছু লোককে নানারকম বুঝিয়ে কদিন চালিয়েছিল। জয়ন্ত কাউকে উল্টোপাল্টা বোঝাতে পারেনি। সাধুপুরুষ ভেবে লোকে সাহায্য করেছে। তরুণ, অরুণও সাহায্য পেয়েছে অনেকের। থাকা খাওয়ার অসুবিধে হয়নি। তবে ক'দিনে কোনও ভালো কাজে যুক্ত থাকেনি। প্রশান্ত সেই গ্রামকে জমিয়ে মাতিয়ে নির্দিষ্ট দিনে বিদায় নিতে চাইল। গ্রামের সবাই কৃতজ্ঞতায় সঙ্গে কিছু দিতে চাইল। প্রশান্ত বলল, 'তোমাদের ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নেওয়ার অধিকার আমার নেই।' সে ব্যাগ থেকে টাকা বের করে বলল, 'এ টাকায় তোমরা ছোটদের বই কিনে দেবে। আর আমার কাছে রইল ট্রেনে ফেরার টাকা।' সকলে আশ্রমে ফিরল। শান্তিস্বরূপ প্রত্যেকের কাছে পনেরো দিনের বিবরণ চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দিল প্রশান্ত। বাকিরাও দিলো। পরেরদিন শান্তিস্বরূপ বললেন, 'তোমাদের মধ্যে প্রশান্ত ছাড়া আর কেউ সন্ন্যাসী হওয়ার উপযুক্ত হওনি। তোমরা চারজন ঠিক করো, গৃহজীবনে ফিরে যাবে, না সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য তৈরি হবে।'

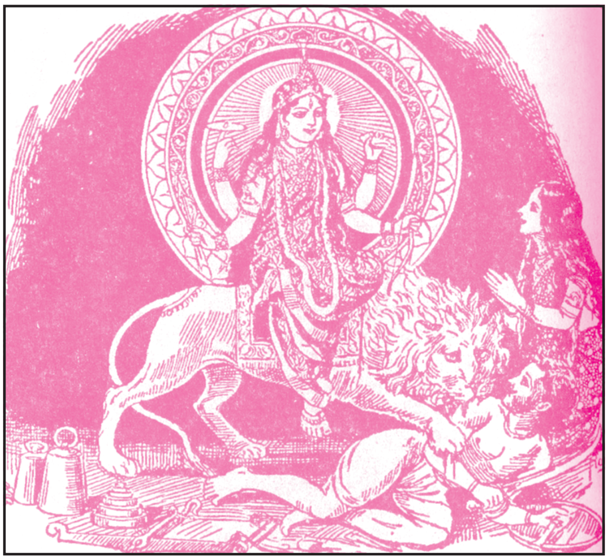

দেবী গন্ধেশ্বরী

নবকুমার ভট্টাচার্য

গন্ধেশ্বরী সওদাগর গন্ধবণিক সমাজের কুলদেবতা। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে এই বণিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন। বস্তুত সমুদ্রযাত্রা, বাণিজ্যের বিস্তার, হিন্দু উপনিবেশ স্থাপন, ধনৈশ্বর্যের সাধনা এবং হিন্দুধর্ম প্রচার— এসব ক্ষেত্রে গন্ধবণিক সমাজের অবদান সর্বজনগ্রাহ্য। তবে গন্ধেশ্বরী কেবলমাত্র বৈশ্য গন্ধবণিক সমাজেরই আরাধ্য দেবী। হিন্দুধর্মের অপর কোনও সম্প্রদায় এই দেবীর পুজো আরাধনা করেন না।

গন্ধেশ্বরীর প্রচলিত মূর্তি জগদ্ধাত্রীর অনুরূপ। ইনি চতুর্ভুজা ও সিংহোপরি সমাসীনা। পুজোপদ্ধতি গ্রন্থে ইনি দুর্গার রূপভেদ হিসেবে পরিগণিত। দুর্গার ধ্যানই গন্ধেশ্বরীর পুজো। এই পুজোর অন্যতম উদ্দেশ্য বাণিজ্যবৃদ্ধি। পুজোর সংকল্পেও এই উদ্দেশ্য উল্লিখিত রয়েছে। গন্ধেশ্বরী প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকার বলেছেন— 'Gandheswari does not appear to be an ancient or medieval deity, but seems to be a late or modern fabrication, proobably meant to serve as the communal goddess of the Gandhabanik.'

বৈশাখী পূর্ণিমায় দেবীর পুজো। পুরাণে বর্ণিত আছে এই দিনে গন্ধেশ্বরী গন্ধাসুরকে বধ করেন। এই পৌরাণিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৈশাখী পূর্ণিমাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। গন্ধেশ্বরী নামটি ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে আধুনিককালে উৎপন্ন বলে অনেকে মনে করেন। প্রাচীন সাহিত্যে গন্ধেশ্বরী নামের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমনকী অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনও রচনাতেও গন্ধেশ্বরীর উল্লেখ মেলে না। গন্ধেশ্বরী এই নামটির উৎসে পৌঁছতে হলে 'গন্ধ' শব্দের খোঁজ করতে হবে। গন্ধদ্রব্যের উৎপন্নকারী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নাম গন্ধবণিক। ধর্মশাস্ত্রে গন্ধেশ্বরী বা গন্ধবণিক শব্দের কোনও উল্লেখ না মিললেও রামায়ণে 'গন্ধোপজীবিনঃ' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। বল্লালচরিতে রয়েছে 'নিগমশ্চ গান্ধিকশ্চ বৈশ্যবংশ সমুদ্ভবৌ'। এই গন্ধদ্রব্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কুলদেবী গন্ধেশ্বরী। কেউ কেউ আবার বলেন চণ্ডীমঙ্গলে যে কমলেকামিনীর দেবীভাবনা রয়েছে— তিনিই গন্ধবণিকের উপাস্যা গন্ধেশ্বরী। এই কমলেকামিনী সুপ্রাচীন কালের দেবতা। ইনি লক্ষ্মীরও এক প্রকাশ। ইনি প্রায় দু' হাজার বছর পূর্বে গজলক্ষ্মী নামে পরিচিতা ছিলেন। অমূল্য বিদ্যাভূষণের 'লক্ষ্মী ও গণেশ' গ্রন্থে এই গজলক্ষ্মীর কিছু পরিচয় রয়েছে। কেউ কেউ এই গজলক্ষ্মীই গন্ধেশ্বরীর আদিরূপ বলে মনে করেন।

গন্ধেশ্বরী পুজোর প্রবর্তন ও গন্ধবণিক সমাজের ইতিহাস প্রসঙ্গে কয়েকটি পুরাণের কথা জানা যায়। 'মহানন্দীশ্বর পুরাণ' ও 'ভবপুরাণ' এই দু'খানি পুরাণে গন্ধেশ্বরীদেবী কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই দু'খানি পুরাণের আবিষ্কারক পণ্ডিত হৃষিকেশ ব্যাকরণ সরস্বতী। ওড়িশা থেকে প্রাপ্ত 'মহানন্দীশ্বর' পুরাণের কিছু কিছু অংশের অনুবাদ ১৩১২ সালে একখানি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পুরাণ দু'খানি শৈব সম্প্রদায়ের প্রাধান্যকালে রচিত। গন্ধেশ্বরী কর্তৃক বণিক-বিরোধী গন্ধাসুরকে বধের কাহিনি দিয়ে শিব মাহাত্ম্য প্রচার পুরাণ দু'খানির প্রতিপাদ্য। পুরাণ দু'খানির রচনাকাল সঠিক বলা যায় না। ভবপুরাণে নানা আখ্যান রয়েছে। পুরাণে বর্ণিত গন্ধাসুর আখ্যান 'বল্লাল চরিতের' বল্লালের অনুরূপ। মহেশ্বর আচার্য প্রণীত আর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ 'সৌগান্ধিক রত্নাকর' গন্ধবণিক জাতির মূল্যবান গ্রন্থ।

বাংলাদেশে কেশরী ও পালবংশের পর গঙ্গাবংশ ও সেন রাজবংশের প্রভুত্ব। গঙ্গাবংশীয়েরা বিষ্ণু ও বুদ্ধ উভয়কে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। অপরদিকে সেনবংশীয়েরা ছিলেন বিষ্ণু উপাসক। সেইসঙ্গে তন্ত্রচর্চাও তাঁদের অনুগ্রহ লাভ করে। বাংলার এই দুই রাজবংশের রাজত্বের সময় শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সম্প্রদায় নিজ নিজ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়। শৈব উপাসকগণ তাঁদের নিজ ধর্মবিশ্বাসকে অটুট রাখলেও তন্ত্র ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। বাংলার তন্ত্রধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের আচার ও সিদ্ধান্ত যে অনেকটা মিলানো মিশানো রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গন্ধেশ্বরী দেবী চণ্ডীর বর্তমান রূপ যা বজ্রযানী বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত। এককালে অনাড়ম্বর ভাবে মেয়েদের ব্রত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ছিল। আজ এই দেবী কোথাও পদ্মাসনা, অতসী পুষ্পবর্ণা ও চতুর্ভুজা, কোথাও সিংহবাহিনী দশভুজা আবার কোথাও লক্ষ্মী প্রতিমার অনুরূপ। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি মালদহ কোচবিহারের কোনও কোনও অঞ্চলে বিবাহ অন্নপ্রাশন প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার কার্যে এখনও গন্ধেশ্বরীর পুজো হয়। বাংলাদেশে এখনও দু একটি গন্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির রয়েছে। বাঁকুড়ায় 'গন্ধেশ্বরী' নামে একটি নদীও রয়েছে। এই নদীর গন্ধেশ্বরী নাম কত কালের? এই নদীর নাম থেকেই কি দেবীর নাম গন্ধেশ্বরী!

ঐতিহাসিক দুর্গ সিংহগড়

সোমশুভ্র চক্রবর্তী

মহারাষ্ট্রের রাজধানী পুণার ৩০ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত শক্তিশালী সিংহগড় দুর্গ, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের স্মৃতিধন্য ও বীর সেনাপতি তানাজী মালসুরের বীরগাথার সাক্ষী।

সহ্যাদ্রী পর্বতমালার, ভুলেশ্বর পর্বতের শীর্ষে ১৩৫০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এবং পুরন্দর, তোড়না ও রাজগড় ইত্যাদি দুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত সিংহগড়ের রণকৌশলগত অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গের ভৌগোলিক অবস্থান, পশ্চিমে অবস্থিত ৪০ ফুট উঁচু দুর্গম ও খাড়াই গিরিচূড়া, দুর্গের দক্ষিণপূর্বে ও উত্তরপূর্বে অবস্থিত দুই শক্তিশালী প্রবেশদ্বার— 'কল্যাণ দরওয়াজা' ও 'পুণে দরওয়াজা', সুদৃঢ় প্রাচীর ও বুরুজ প্রভৃতি দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। মসৃণ পাথুরে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত 'পুণে দরওয়াজা'-কে তার পার্শ্বে অবস্থিত শঙ্কর বুরুজ এবং তীক্ষ্ণ খিলানযুক্ত সছিদ্র প্রাচীর সুরক্ষা প্রদান করতো। দুর্গচত্বরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ ও অট্টালিকার অবশিষ্ট অংশবিশেষ দুর্গের প্রাচীনত্বের সাক্ষীস্বরূপ। কৌন্ডিন্যেশ্বর মহাদেব মন্দিরের গুহা ও ভাস্কর্যগুলি থেকে অনুমিত হয় যে দুর্গটি প্রায় দু' হাজার বছর পূর্বে নির্মিত। দুর্গের অন্যতম দর্শনীয় স্থানগুলো হলো— মা ভবানীর প্রাচীন মন্দির, মন্দিরের দক্ষিণে রাজারামের স্মৃতিসৌধ ও মারাঠাদের 'সিংহগড়' বিজয়ের কাণ্ডারী সিংহবিক্রমী তানাজীর আবক্ষ মূর্তি।

কোলি জাতিদের অধিকৃত সিংহগড়ের পূর্ব নাম ছিল 'কোণ্ডনা'। ১৩২৮ খৃস্টাব্দে মহম্মদ বিন তুঘলক কোলী গোষ্ঠী অধিপতি নাগ নায়েককে পরাজিত করে দুর্গটি হস্তগত করেন। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কোণ্ডানা বিজাপুরের আদিলশাহী সর্দার সিদ্দি অম্বরের অধিকৃত ছিল। মহারাষ্ট্রে হিন্দবী স্বরাজের প্রাণপুরুষ ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ ১৬৪৭ সালে বাপুজী দেশপাণ্ডের সহায়তায় দুর্গটি তার উদীয়মান স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৬৪৯ সালে শিবাজীর পিতা শাহজী আদিলশাহী সর্দারগণের চক্রান্তের ফলে বন্দি হন এবং তার মুক্তিশর্ত অনুযায়ী শিবাজী ''কোণ্ডানা'' বিজাপুরকে সমর্পণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৬৫৭-তে প্রবল পরাক্রমে মারাঠাবাহিনী সিংহগড় দখল করে। ১৬৬১, ১৬৬৩ ও ১৬৬৫ সালে দুর্গে মোঘল আক্রমণ মারাঠা বীরগণ প্রবল বিক্রমে প্রতিহত করেন। ১৬৬৫ সালে 'পুরন্দরচুক্তি' অনুসারে সিংহগড় মির্জারাজা জয়সিংহের হস্তগত হয়। মুঘল সর্দার উদয়ভানু রাঠোর পান দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব। ১৬৭০ খৃস্টাব্দে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ দুর্ভেদ্য 'সিংহগড়' পুনরায় দখলের দায়িত্ব অর্পণ করেন বাল্যবন্ধু ও সেনাপতি তানাজী মালসুরেকে।

তানাজী ও তার ভ্রাতা সূর্যাজী মাত্র পাঁচশ মাওলী সৈন্য নিয়ে দুর্গের পশ্চিমে অবস্থিত খাড়াই গিরিসংকট পেরিয়ে দুর্গ আক্রমণ করেন। তানাজী ও তিনশ মারাঠা প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে দুর্গের আরব ও পাঠান সৈন্যদলের ওপর অতর্কিতে তীব্র আক্রমণ চালান। মারাঠাদের 'হর হর মহাদেব'-এর ধ্বনিতে চতুর্দিক কম্পিত হয়। তাদের অসির আঘাতে অসংখ্য মুঘলসৈন্য নিহত ও আহত হয়। রণক্ষেত্রে অসীম বীরত্বের সঙ্গে শত্রুসৈন্য সংহার করতে করতে বীর তানাজী দুর্গরক্ষক উদয়ভানুর সঙ্গে তীব্র মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হন। অন্তে উভয়েই উভয়ের তীব্র আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। শূরবীর সন্তান তানাজীর চরম বলিদানে ধন্য হয় মহারাষ্ট্র তথা ভারতভূমি। ইতিমধ্যে 'কল্যাণদ্বার' বিধ্বস্ত করে সূর্যাজী দুশো মারাঠাসৈন্যর সঙ্গে দুর্গে প্রবেশ করলে তানাজীর মৃত্যুর ফলে নেতৃত্বহীন মারাঠা সৈন্যদলে সঞ্চারিত হয় নতুন প্রাণ ও উদ্যম। সূর্যাজীর নেতৃত্বে তারা পলায়নপর মুঘল সৈন্যদের সমূলে সংহার করেন। মাত্র পাঁচশ মারাঠার বীরত্বে প্রায় সহস্রাধিক মুঘল সৈন্য নিহত হয় এবং সহস্রাধিক হয় বন্দি। মারাঠাপক্ষের ৫০ জন শূরবীর রণে বীরগতি লাভ করেন। বীর তানাজী ও তার সৈন্যদলের অভূতপূর্ব শৌর্যে 'কোণ্ডানা' পুনরায় শিবাজীর স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দুর্গজয়ের সুসংবাদের সঙ্গে শূরবীর তানাজীর মৃত্যু সংবাদে ব্যথিত হৃদয়ে ছত্রপতির উক্তি ছিলো--- ''গড় আলাপন সিংহ গেলা'', অর্থাৎ ''গড় এলো কিন্তু সিংহ চলে গেল''। তানাজীর গৌরবময় স্মৃতিতে শিবাজী কোণ্ডানার নাম বদলে দুর্গটিকে 'সিংহগড়' নামে বিভূষিত করেন।

১৬৮৯ সালে ছত্রপতি শম্ভাজীর মৃত্যুর পর সিংহগড় মুঘলদের অধিকারে এলেও ১৬৯৩-তে পুনরায় মারাঠাদের অধিকৃত হয়। ছত্রপতি রাজারামের নেতৃত্বাধীন মারাঠা শক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল সিংহগড়। সিংহগড়েই মাচ ১৭০৩ খৃস্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হয়। ১৭০৩ খৃস্টাব্দে সম্মুখ যুদ্ধে অপরাজেয় সিংহগড়কে মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেব উৎকোচের সাহায্যে দখল করতে সক্ষম হলেও ১৭০৬ সালে পর্যন্ত প্রতিনিধিদের পরাক্রমে পুনরায় মারাঠা শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয় সিংহগড়। ১৮১৮ সাল অবধি মারাঠা শাসনাধীন থাকার পর তিনমাসের ঘোর সংগ্রামের শেষে সিংহগড় বৃটিশবাহিনী দ্বারা অধিকৃত হয়। বর্তমানে সিংহগড় ভারতীয় সেনার ''National Defence Academy''-এর অন্তর্গত একটি অংশ। পরাক্রমী শূরবীর তানাজী মালসুরের বীরোচিত কীর্তির সাক্ষী সিংহগড় আসমুদ্র হিমাচলের দেশভক্ত ভারত সন্তানদের কাছে পুণ্য তীর্থ রূপে সহ্যাদ্রীর বুকে রত্নমালার ন্যায় শোভায়মান।

বড়োদের পরামর্শ

‘ছোটোরা ছবি আঁকুক তাদের মতো করে, বড়োরা উৎসাহ দিন’

বললেন ভাস্কর মাধব ভট্টাচার্য

আমাদের দেশের আধুনিক ভাস্করদের একজন মাধব ভট্টাচার্য। ছোটোবেলা থেকেই মূর্তি গড়ার ঝোঁক ছিল। বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে কুমোরটুলিতে গিয়ে মৃৎশিল্পীদের কাজ দেখতেন। মাটির নরম তাল থেকে কীভাবে এক একটা জিনিস গড়ে উঠছে তা দেখে অবাক হতেন। বাগবাজারের মহারাজা কাশিমবাজার স্কুলে ছাত্র থাকার সময়ে উৎসাহ পেয়েছেন শিল্প-শিক্ষকদের কাছে। বাড়িতে বিভিন্ন পুজোর সময় মা ঠাকুমা পিসিমাদের দেখতেন আলপনা দিতে। কতরকম পুতুল তৈরি করতেন তাঁরা। স্কুলের পড়া শেষ করার পর ভর্তি হন সরকারি আর্ট কলেজে। ভাস্কর্য নিয়ে চর্চা করেন। সেখান থেকে পাশ করেন ১৯৫৬ সালে। তিন বছর পাঠ নিয়েছেন ভদোদরায় মহারাজা সয়াজিরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে। কাজ শিখেছিলেন ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরীর কাছে। অন্যান্য শিক্ষকও ছিলেন। ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে সেরামিকের কাজে তালিম নেন। জয়পুরের মাকরানায় শিল্প শিবিরে যোগ দেন। ১৯৬২-তে কেন্দ্রীয় সরকারের বিড়লা ইনডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে যোগ দেন শিল্পী হিসেবে। ১৯৩৩ সালে মাধব ভট্টাচার্যের জন্ম। ১৯৬১ সালে ললিতকলা অ্যাকাডেমির পুরস্কার পান। দেশে বিদেশে অনেকের সংগ্রহে তাঁর ভাস্কর্য রয়েছে। ছোটোদের আঁকাজোঁকা সম্পর্কে পরামর্শ দিলেন।

ভাস্কর মাধব ভট্টাচার্য।

‘একসময় বাড়িতে বড়োরা ছোটোদের স্কুলের পড়াশোনার বাইরে কিছু করতে উৎসাহ দিতেন না। তাঁদের পছন্দ ছিল না ওইরকম কাজ। যার মধ্যে ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া রয়েছে। এখন অবশ্য বাড়ির লোকজনের ধারণা অনেকটা বদলেছে। ছবি আঁকার ইচ্ছে সকলেরই থাকে। চারপাশেই তো ছবি। দেখতে হবে মন দিয়ে। ফুল ফল গাছ পাতা জীবজন্তু ঘরবাড়ি সবকিছু কেমন সাজানো। দোকানে নানান জিনিস কিনতে যাও কারো সঙ্গে, সেখানেও দেখবে প্রতিটি জিনিস যত্নে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে। যাতে সকলের ভালো লাগে। আর কাজের সুবিধে হয়।’

‘তোমরা আঁকা অভ্যেস করবে মন দিয়ে। যা খুশি আঁকবে। খুব ছোটোরা রং ব্যবহার করে সাহসের সঙ্গে। একটু বড়ো হয়ে যখনই ছবি আঁকার নিয়মকানুন বেশি শিখতে বাধ্য হয় তখন খেয়ালখুশির মনটা হারিয়ে যায়। নানা জিনিস দেখার অভ্যেস ছোটোদের থাকে। তারা তাদের মতো ভাবে। যে ভাবনার সঙ্গে বড়োদের ভাবনা মেলে না। সেজন্যে ছোটোদের দেখার জন্যে বোঝার জন্যে অন্য মন চাই। তোমরা যা আঁকবে তাই-ই ভালো লাগবে। কারও দেখে নয়। তোমার মতো করে আঁকো। বড়োরা একটু দেখিয়ে দিতে পারেন বড়জোর। আঁকার মধ্যে মজা পেয়ে গেলে দেখবে একটার পর একটা ছবিতে খাতা ভরে উঠেছে। বড়োরা অবাক হয়ে যাবে দেখে।’

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কৌশিক গুহ

অন্য বার্তা

টাইটানিক

স্মৃতি ধরে রাখার ব্যবস্থা হোক

টাইটানিকের নাম সকলেই শুনেছি। সেই জাহাজ সম্পর্কে কত কথা আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। ১৯১২ সালের ১৫ এপ্রিল ওই নামের জাহাজ ডুবে যায়। একটা জাহাজ মানে বিশাল ব্যাপার। ছোট পালতোলা জাহাজ নয় বিরাট আকারের জলযান তৈরি হয়েছিল সমুদ্রপথে এগিয়ে চলার জন্যে। জাহাজ সাগরজলে ভাসানোর আগে রীতিমতো প্রস্তুতি পর্ব চলেছিল। আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর আগে সবদিক থেকে মিলেছিল সবুজ সঙ্কেত। আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছিল সকলের মধ্যে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আনন্দ ভরে গেলো বিষাদে। যাত্রা শুরুর দিনকয়েক পর জাহাজ ধাক্কা খেয়েছে হিমশৈলে। যাত্রাপথে বিপদ-আপদ থাকতেই পারে। কিন্তু ওইভাবে হিমশৈল সব পরিকল্পনা বানচাল করবে কারও ধারণা ছিল না।পরে আরও কত জাহাজডুবি হয়েছে। কিন্তু টাইটানিকের মতো খারাপ ভাগ্য কারও ছিল না।

একশো বছর বাদে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণের দাবি অনুমোদন করেছে ইউনেসকো। অবশ্য অনেক বছর ধরে ঐতিহাসিকরা টাইটানিক সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন। জাহাজের মধ্যে যেখানে যা ছিল তা সেভাবে রাখার কথা বলেছেন সংরক্ষণের দাবি জানানো সংস্থা। জাহাজ ডুবে গিয়েছিল উত্তর অ্যাটলান্টিকে। নিউ ফাউন্ডল্যান্ড দ্বীপের কাছে চার হাজার মিটার গভীর জলে টাইটানিক রয়েছে। সেই জাহাজের ধ্বংসাবশেষ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইউনেসকো দিয়েছে নিউ ফাউন্ডল্যান্ডকে। টাইটানিক সম্পর্কে আরও তথ্য আগামীদিনে হয়তো পাওয়া যাবে— একথা ঐতিহাসিকরা বলছেন।

বার্তাবহ

বইয়ের টানে

'বই পড়তে গেলে তার যত্ন চাই'— একথা সবসময় স্কুলের বড়দি বলেন। কারও কারও বই থাকে ছেঁড়াখোঁড়া। কেউ বই ব্যাগে ভরার সময় যেমন তেমন ভাবে ঢোকায়। বই কথা বলতে পারে না ঠিকই, কিন্তু প্রতিটি বই যত্ন চায়। বইয়ের মলাট দেওয়া হয় তাতে ময়লা কম লাগার জন্যে। কেউ কেউ বইয়ের পাতায় পাতায় নাম লিখে জানাতে চায় বইটা তারই। কারও কারও স্ট্যাম্প তৈরি থাকে নামের। খেয়াল খুশি মতো পাতায় মারে। লাইব্রেরিতে বইয়ে স্ট্যাম্প মারার রীতি আছে। যেখানে সেখানে নয়। কয়েকটা নির্দিষ্ট পাতায় ছাপ থাকে। পড়ার জন্যে টেকসট বইয়ে দাগ দেওয়া যেতে পারে। তবে তা এমনভাবে দেওয়া দরকার, যা পরে তুলে দেওয়া যায়। এজন্যে পেনসিলে দাগ দেওয়াই ভালো। মনে রাখা চাই বইটা আরও কারও ব্যবহারে লাগাতে পারে। আগে বাড়িতে দাদা দিদিদের বই ভাইবোনেরা পড়ত। কোনও অসুবিধে হোত না। নতুন বই কেনার ক্ষমতা সব অভিভাবকের থাকে না। সেজন্যে যত্নে রাখা দরকার বইগুলো, অন্য ছেলেমেয়ের ব্যবহারে যাতে অসুবিধে না হয়।

নিজের বই যত্নে রাখলে পড়তে ভালো লাগবে। পড়ার জায়গা পরিষ্কার থাকবে। খাতা বইপত্রও। ছোটোদের শেখালে তারা চটপট শিখে যাবে।

স্কুলে পড়ার সময় বইয়ের যত্ন শিখলে তা বাকি জীবনও মনে থাকবে। বইকে ঠিকমতো ভালোবাসার অভ্যেস গড়ে উঠলে তা ছাড়া যায় না। একজনের দেখাদেখি অন্যরা শিখে নেবে। বই শুধু যত্ন করলে হবে না তা পড়তে হবে নিয়ম মেনে। বইকে একটু ভালোবাসতে না পারলে পরে কাউকে বলতে পারা যাবে না, 'বইয়ের যত্ন করতে শেখো।'

—*বইমিত্র*

প্রশ্নবাণ

১. হায়দরাবাদের বিখ্যাত নিজাম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম অধ্যক্ষ কে?

২. বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম শারদীয় পত্রিকা কী?

৩. ভারতে প্রথম ডাকটিকিট চালু হয় কবে?

৪. কোন সাধক কবিরঞ্জন সম্মানে ভূষিত?

৫. তাঁকে কে কবিরঞ্জন সম্মানে ভূষিত করেছিলেন?

উত্তর : ১. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ২. পার্বণী, ৩. ১৮৫২ সালের ১ জুলাই, ৪. রামপ্রসাদ সেন, ৫. কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

ছোটোদের বলছি

ছোটোদের কথা সবসময় ভাবে 'স্বস্তিকা।' সেই ভাবনা থেকে তৈরি হয়েছিল ছোটোদের বিভাগ 'নবাঙ্কুর'। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর নতুনভাবে বিভাগটি শুরু হয়েছে। ছোটোরা জানাও কেমন লাগছে। নিজেদের লেখা, আঁকা পাঠাও।

—*সম্পাদক, স্বস্তিকা।*

উল্টো পাল্টা

ডাক্তার : কেমন আছেন?

রোগী : খুব খারাপ।

ডাক্তার : খারাপ কেন?

রোগী : ভাল থাকলে তো বলবেন, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ঘুষ নইলে স্মাগলিং-এর সঙ্গে জড়িত আছি। নইলে এই বাজারে ভাল থাকা যায়!

ডাক্তার : এখন প্রেসার কেমন?

রোগী : সাংঘাতিক প্রেসার। টোটাল জীবনটাই তো প্রেসারে আছে।

ডাক্তার : কীরকম?

রোগী : জলের প্রেসার, গ্যাসের প্রেসার, ছেলেদের প্রেসার, স্ত্রীর প্রেসার, অফিসে বসের প্রেসার, রাস্তায় গাড়ীর প্রেসার, বাজারে মানুষের প্রেসার—

ডাক্তার : বুঝতে পেরেছি—মাথাটাথা ঘোরে?

রোগী : ঘোরে মানে, ডেনজারাস ঘোরে।

ডাক্তার : কখন ঘোরে?

রোগী : বাজারে গেলেই ঘোরে।

ডাক্তার : কেন বলুন তো?

রোগী : জিনিসপত্রের হঠাৎ হঠাৎ বাড়তি দাম শুনে মাথা ঘোরে।

ডাক্তার : তাহলে আপনার অসুবিধেটা কোথায়?

রোগী : আপনি সুবিধেটা দেখলেন কোথায়? সবকিছুতেই তো অসুবিধে।

রঙিন মাছ চাষ করি আনন্দে

প্রীতি বসু

বর্তমানে রঙিন মাছ পোষা ও তাকে ছোট্ট কাঁচের বাক্সে জল, নুড়ি পাথর ও ছোটগাছ-শ্যাওলা প্রভৃতি দিয়ে কৃত্রিম প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে তাতে নানান রকম রঙিন মাছ সাঁতার কাটছে এমন ব্যবস্থা করে ঘর সাজানো খুবই প্রচলিত হয়েছে। এতে দেশের মানুষের রুজি-রোজগারের যেমন একটা ব্যবস্থা হয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক বাজারেও এর যথেষ্ট চাহিদা আছে।

এই রঙিন মাছের চাষের প্রচলন হওয়ার ফলে বহু মহিলাই রোজগারের একটা পথ পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যদপ্তর রঙিন মাছের ব্যাপারে সমবায় গঠন করে ও মহিলা পরিচালিত সমবায়ের মাধ্যমে রঙিন মাছচাষ, পালন, প্রজনন ও বিপণন করার ব্যবস্থা নিয়েছে। এখনও পর্যন্ত কমবেশী ২০০টির মতো মহিলা সমবায় গঠিত হয়েছে। যোগাযোগের মাধ্যমে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন সংস্থার টাকায় বহু সমিতি ও তাদের সদস্যগণ— অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল, হুগলি প্রভৃতি অঞ্চলের বউ মেয়ে— শিখা, সুষমা, লক্ষ্মী সমবায় গঠন করে বা অসংগঠিতভাবে রঙিন মাছ চাষের কল্যাণে দু-পয়সা আয় করছে।

এই মাছ চাষ বেশ সহজ মনে হলেও অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এ চাষ করতে না পারলে, ব্যবসাক্ষেত্রে প্রথম দিকে বিশেষ লাভজনক হয়ে উঠতে পারবে না। এজন্য বিভিন্ন প্রকল্পের যেমন অর্থ যোগানের ব্যবস্থা আছে, তেমনি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীও আছে।

রঙিন মাছ চাষ করা, প্রতিপালন করা বা প্রজনন করার জন্য নানাবিধ জলাধার— যার পোষাকী নাম অ্যাকোরিয়াম, মাটি বা সিমেন্টের ভ্যাট, ছোট পুকুর বা ডোবা, হাপা বা মশারি জাল, সিমেন্টের পাকা চৌবাচ্চা বা ফাইবার নির্মিত চৌবাচ্চা প্রভৃতি ব্যবহার করা চলে। সিমেন্টের বা ফাইবার গ্লাসের চৌবাচ্চাই ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো। মাচ চাষের জন্য উপরোক্ত পাত্রগুলি তৈরি করার আগে মৎস্য দপ্তরের জেলা অফিসে বা ব্লক মৎস্য আধিকারিকের পরামর্শ ও কোনও ফার্মের থেকে পরামর্শ নেওয়া ভাল।

মাছ চাষের জন্য বিদেশী বাহারী রঙিন মাছ ছাড়াও আমাদের দেশের পুঁটি, খোলসে, ন্যাদোস, ট্যাপা, চাঁদা, সিঙি, মাগুর, ল্যাটা, শোল, কই প্রভৃতি মাছও চাষ করা চলে। বিদেশের বাজারে সেগুলিরও চাহিদা আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুষমা জোনাল ট্রেনিং থেকে আমরা দেখেছি, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য প্রথমে সহজে পালন করা যায়, সহজে চারাপোনা পাওয়া যায় এবং পরস্পর মিলেমিশে থাকতে পারে, এমন সব প্রজাতির মাছ ছাড়াটাই ভাল।

অঙ্গনা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার শহর ঘেঁষা গ্রাম ঠাকুরাণী চক। সেখানকার বউ, বেহালার মেয়ে শিখা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। তার একটি ছেলে ও স্বামী নিয়ে সংসার। স্বামী ড্রাইভারি করেন। শিখা জানাল--- স্বামীর আয়ে মোটামুটিভাবে সংসার চলে ঠিকই, কিন্তু ছেলের পড়াশুনোর খরচ চালিয়ে একটু নিজস্ব ঘরবাড়ী করা, একটু স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখা খুবই কষ্টকর। স্বামী কাজে এবং ছেলে স্কুলে চলে গেলে অনেকটা ফাঁকা থাকি। তাই ভাবছিলাম— অবসর সময়ে নিজেও যদি কিছু রোজগার করতে পারি। এরকম অবস্থায় রঙিনমাছ চাষের ব্যাপারটা জানতে পেরে এতে যোগ দিই।

শিখার কাছে তার অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলে সে জানাল— বিদেশী মাছের দিকেই আমার বেশী আগ্রহ। যে-সব বাহারী মাছ দেখা যায়, তার ৯৫ শতাংশই বিদেশী মাছ। একদম শুরুতে গাপ্পি, মলি, প্ল্যাটি ও সোর্ডটেল চাষ করে অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে নিয়ে অ্যাঞ্জেল, গোল্ডফিস প্রভৃতি মাছ চাষ করা যায়। যথাযথ পরিচর্যা করতে পারলে, এইসব প্রজাতির মাছ মোটামুটি আড়াই-তিন মাসের মধ্যেই বিক্রির উপযুক্ত হয়ে যায়।

রঙিন মাছ চাষ মহিলা সমিতির সঙ্গে যুক্ত আছেন, এরকম কয়েকজন মহিলার থেকে জানতে পারলাম— এই চাষ করার জন্য মৎস্য দপ্তর থেকে বা তার মাধ্যমে, ব্যাংক বা এম পি ই ডি এ সংস্থা থেকেও ঋণ ও অনুদান পাওয়া যায়। কমপক্ষে দশজন মহিলা এ ব্যাপারে উৎসাহী হলে খুব সহজেই 'রঙিন মাছ চাষ মহিলা সমবায় সমিতি' গঠন করতে পারেন। এই সমিতির সদস্যগণ প্রশিক্ষণ থেকে সবরকম আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন।

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বেশ কিছুদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, যথা— উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি এলাকায় রঙিন মাছ চাষ চলছে এবং অনেকেই এটিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই রঙীন মাছ চাষের প্রস্তুতি থেকে পরিণতি পর্যন্ত অনেক ধরনের কাজ আছে। যেমন— চাষ করবার জন্য আধার অর্থাৎ চৌবাচ্চা ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরি, প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে মাছের বাচ্চা সংগ্রহ, সেগুলিকে পালন করে বড় করা, প্রজনন করে বাচ্চা তৈরি করা,জলাশয় থেকে প্রাকৃতিক খাদ্য--- কেঁচো বা ড্যাফনিয়া, প্রাণীকণা— যাকে বলা হয় জু-প্ল্যাংটন প্রভৃতি সংগ্রহ করা প্রভৃতি। এর সঙ্গে যুক্ত আছে দেশে ব্যবসা ও বিদেশে রপ্তানি।

হাওড়া জেলার নিলি, মঙ্গলারা বেশ কয়েক বছর ধরেই সরাসরি রঙিন মাছ চাষ না করলেও এই মাছ চাষের সঙ্গে যুক্ত আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি করে বেশ কিছু আয় করতে করতেই কিশোরী থেকে যুবতী হয়ে উঠলো। তাদের কেউ কেউ অ্যাকোরিয়াম ও চাষের অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরি করে বিক্রি করে, কেউ কেউ পুকুর, ডোবা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে ছোট ছোট মাছ সংগ্রহ করে রঙিন মাছ যাঁরা সরাসরি চাষ করেন, তাঁদের কাছে বিক্রি করে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার অনেকখানি অঞ্চলই আজ বর্ধিত কলকাতার অংশ হয়ে গিয়েছে— এরকমই এক অঞ্চলের বয়স্কা শিক্ষিতা সুলক্ষণাদি জানালেন--- খুব অর্থাভাবে ভুগছিলাম। এমতাবস্থায় রঙিন মাছ চাষের ব্যাপারটা জানতে পারি। তখনই আমি ও আমাদের অঞ্চলের বেশ কয়েকজন মহিলা খোঁজ খবর করে রঙিনমাছ বিপণনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি।

ম্যাডাম, মনমোহনের ভরসা ম্যানেজার মুখোপাধ্যায়

মাননীয় প্রণব মুখোপাধ্যায়
অর্থমন্ত্রী, ভারতর সরকার
মহাশয়,

সাদা ধুতি পাঞ্জাবি আর গম্ভীর মুখের আপনাকে 'মহাশয়' ছাড়া সম্বোধন করা যায় কি প্রণববাবু? আপনাকে অনেকে একালের চাণক্য বলে থাকে। আমি অবশ্য আপনাকে দক্ষ 'ম্যানেজার' বলে মনে করি। রোয়াকের ভাষায় আপনি হলেন ম্যানেজ মাস্টার। ইন্দিরা গান্ধী টু সোনিয়া গান্ধী সবকালেই ম্যানেজারি করে এসেছেন দক্ষ হাতে। রামদেব বাবাকে ঠান্ডা করতে হবে, আন্না হাজারের অনশন তুলতে হবে, টুজি থেকে মনমোহনজিকে উদ্ধার করতে হবে, সবেতেই ১০ নম্বর জনপথবাসিনী ছড়া কাটেন, 'দল পড়েছে মহা ফাঁপরে, উদ্ধার করবে কে/ঘরে আছেন প্রণববাবু কোমর বেঁধেছে।' তাতে দল যে লাভবান হয়েছে সেটা ইতিহাসই বলে দেয়। তবে সব সময় সেসব ম্যানেজারি স্থায়ী ফল দেয়নি। কখনও কখনও বিপদ বাড়িয়েছে। আবার নতুন ম্যানেজারির থিওরি বার করে সেই পরিস্থিতি থেকে দল ও নেত্রীকে উদ্ধার করেছেন। তবে দেশ বা দশ উদ্ধার পেয়েছি কি?

যাক সেসব কূট প্রশ্ন করে বিব্রত করব না। আপনি বরাবরই মাতৃশক্তির পুজারী। আশ্বিনের মাঝামাঝি, উঠিবে বাজনা বাজি। দেবী দুর্গার আগমন বার্তা পেলেই আপনি দিল্লির পাট চুকিয়ে ফি বছর চলে আসেন বাংলার গ্রামের বাড়িতে। বসে যান চণ্ডী আরাধনায়। পট্টবস্ত্র পড়ে টিভি ক্যামেরায় বলেন, বছরের এই কটা দিন একটু চণ্ডী আরাধনা আমার নিয়মিত বিষয়। কিন্তু আমি তো দেখি সারা বছরই আপনি দেবী চণ্ডীকে পুজো দিয়ে চলেন। তবে দেবীর বদলে আপনিই দেবীকে বরাভয় দেন। সেই দেবীর স্থায়ী মণ্ডপ নয়াদিল্লীর ১০ নম্বর জনপথ।

তবে ইদানীং এক দেবী আপনাকে খুব মুশকিলে ফেলেছে। না, কথাটা একটু ভুল হয়ে গেল। মুশকিলে পড়ার রাস্তাটা তো আপনি নিজেই তৈরি করে দিয়েছেন। আসলে আপনার স্টাইলটাই হচ্ছে ঠাণ্ডা মাথায় কিছু একটা 'অফ দ্যা রেকর্ড' কথা দিয়ে দেওয়া। তাতে আপাতত সমস্যা মিটে গেল। সবাই ধন্য ধন্য করে উঠল, আহা, এত বড় শরিকি সমস্যা, প্রণববাবু গেলেন, দেখলেন আর জয় করলেন। সবাই ভাবে প্রণববাবুর মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় দু'নম্বর মানুষটি নিশ্চয়ই সঠিক কথা দিচ্ছেন। একথা কখনওই দু'নম্বরি কথা হতে পারে না। কিন্তু সেসব দেওয়া কথা বাস্তবায়িত না হওয়ায় পরে কেন্দ্রীয় সরকারকে, আপনার দল কংগ্রেসকে, আপনার নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে, আপনার প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে কথা না রাখার অভিযোগ শুনতে হয়। অনেকে তো বলেন, আপনি নাকি, আদৌ সম্ভব নয় এমন কথা সোনিয়া বা মনমোহনের সঙ্গে আলোচনা না করেই প্রতিপক্ষকে আশ্বাস দিয়ে দেন। সাময়িক শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু কটাদিন যেতে না যেতেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। তখন আপনাকে অন্য ম্যানেজারি থিওরি নিয়ে আসরে নামতে হয়। আবার চলে কথা দেওয়া। এবং কথা না রাখা। এই থিওরি শতকের পর শতক ধরে জিইয়ে রেখেছে কাশ্মীর সমস্যা, ছিটমহল সমস্যা, লোকপাল প্রশ্ন, তেলেঙ্গানা সহ বিভিন্ন রাজ্যকে ভাগ করার বিতর্ক। এই তালিকা বানাতে গেলে অনেক কাগজ, অনেক কালি লাগবে। বেশ কিছু পেনের নিব ক্ষয়ে যাবে। আর সেইসব জিইয়ে রাখা ক্ষত থেকে মাঝে মাঝেই রক্ত ঝরে পড়ছে। সব মিলিয়ে ক্ষতে ক্ষতে গোটা দেশটার গ্যাংগ্রিন হওয়ার দশা।

প্রণববাবু শুনতে কষ্ট হলেও আপনাকে মানতে হবে আপনাদের দলের পিতামহ নেহরু সেই যে কাশ্মীর নামক ক্ষত তৈরি করে যে ধারা শুরু করেছিলেন তা আজও অক্ষত আপনাদের নেতৃত্বে। যাকে যত খুশি দোষ দিন, গাল পাড়ুন, ইতিহাস সত্যি কথাটাই বলবে যে অযোধ্যা থেকে গোর্খাল্যান্ড, সন্ত্রাসবাদ থেকে মাওবাদ, সব ক্ষেত্রে যথা সময়ে যথার্থ পদক্ষেপ না করে, সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছেন আপনারা। আর তার খেসারত দিয়ে চলেছে দেশ বছরের পর বছর।

যাক, কাজের কথায় আসি। আগেই বলেছি আপনি যাবতীয় কথা দেন 'অফ দ্যা রেকর্ড'। এই যেমন এরাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে যখন জোট নিয়ে মহা জট তখন আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে অনেক কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেসব কথার কোনও রেকর্ড নেই। বলেছিলেন, কেন্দ্রের দেওয়া ঋণের সুদ মুকুব করে দেবেন, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য এবং আর্থিক দুরবস্থা মোকাবিলায় স্পেশাল প্যাকেজ দেবেন। সেসবে বিশ্বাস করে ভোটের লড়াই হলো। সরকার হলো। আপনারাও সেই সরকারে ঢুকলেন। কিন্তু যোজনা কমিশনের টাকা বাড়ানো ছাড়া আর কী-ইবা করেছে কেন্দ্র। আচ্ছা যোজনা কমিশন আগের বারের তুলনায় টাকা বেশি দিয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর পার্ষদরা যে নেত্য করছে তার কোনও যুক্তি আছে বলুন? আপনি তো টাকা পয়সার বিষয়টা ভাল বোঝেন, তাতেই তো দেখুন না, জিনিসপত্রের দাম যে ভাবে বেড়েছে তাতে স্বাভাবিকভাবেই তো যোজনা বরাদ্দ বাড়বে। এটা আবার বাড়তি কী? তাছাড়া এও তো রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'অফ দ্যা রেকর্ড' যেকথা দিয়েছিলেন সেসব কথা রেখেছেন কি?

ভেবেছিলেন ম্যানেজ করে ফেলবেন। কিন্তু এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছেন যে ভবি ভোলার নয়। এবার কিন্তু সুদ আদায় নিয়ে শরিক তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বড় সংঘাত হবেই। এর আগে তিস্তার জল বন্টন থেকে এন সি টি সি একের পর এক ইস্যুতে মেরুদণ্ডহীনের মতো নত হয়ে ভাঙা বেড়া দেখিয়ে দিয়েছেন। এবার ভাবুন ঠেলা সামলাবেন কী করে। তবে আমার বিশ্বাস আছে আপনি ঠিক ম্যানেজ করে ফেলবেন। আরও একবার প্রমাণ করবেন কেন্দ্রের পঙ্গু সরকারে আপনার মতো একজন 'ম্যানেজার' কতটা দরকারি।

শুভেচ্ছা রইল।

—সুন্দর মৌলিক

পরিবারতন্ত্রই কংগ্রেসের ধ্বংসের কারণ

অতিথি কলম

জয় দুবাসী

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর এক কংগ্রেসী নেতাকে বলতে শোনা গেল, উত্তরপ্রদেশের ভোটাররা কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বাস্তবে এটা সত্যি নয়। কংগ্রেস শুধু উত্তরপ্রদেশ নয়, গোয়া এবং পাঞ্জাবেও ভোটারদের দ্বারা বাতিল হয়েছে। কেবল উত্তরাখণ্ডেই কোনওক্রমে পিঠ বাঁচিয়েছে। তবে, আমার মনে হয় এটা সামগ্রিক কংগ্রেসকে

প্রত্যাখ্যান নয়। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট একটি পরিবারকে ঘাড়ধাক্কা দেওয়া বললেই হয়তো ঠিক বলা হবে। না, আমি আর একটু ভোঁতাভাবেই বলতে চাই। এই নির্বাচনে আদতে সোনিয়া গান্ধী ও তাঁর স্তাবকেরাই ভোটারদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। অচিরেই তারা দিল্লীর মসনদ থেকেও বিতাড়িত হবে।

পরিবারতন্ত্রই কংগ্রেসের ধ্বংসের কারণ :

প্রায়শই বাজারে এটা চাউর করা হয় যে রাহুল গান্ধীর প্রচারের ফলেই কংগ্রেস ধ্বংসের হাত থেকে কিছুটা বেঁচে গেছে। তিনি আরও জমাট প্রচার চালাবার সুযোগ পেলে কংগ্রেসের ফল আরও ভাল হোত। অতি বড় মিথ্যা। কংগ্রেসের ধরাশায়ী হওয়ার কারণই হচ্ছে গান্ধী পরিবার। একটু নজর করলে দেখবেন, পরিবার যেখানে যেখানে পা ফেলেছে সেখানে সেখানেই কংগ্রেস ধুলোয় মিশে গেছে। সোনিয়া গান্ধী তাঁর ছেলের লোকসভা কেন্দ্র আমেঠির অন্তর্গত একই নামের বিধানসভা কেন্দ্রে যাওয়ায় সেখানকার কংগ্রেস প্রার্থী হেরে গেছে। তাঁর নিজের কেন্দ্র রায়বেরিলীতেও তিনি দর্শন দেন। পরিণাম— কংগ্রেস প্রার্থীর শোচনীয় পরাজয়। হায়! তিনি সমুদ্র শহর গোয়াতেও পদধূলি দিয়েছিলেন। কংগ্রেস সেখানে প্রায় মুছে গেল। লক্ষ্য করার বিষয় এই পরিবার যেখানেই মুখ দেখিয়েছে, অনেক সময় আবার নাতি-পুতি সহ একটা পারিবারিক আউটিং-এর চেহারা দেবার অপচেষ্টা করেছে, সেখানেই বেচারা কংগ্রেস দল কচুকাটা হয়েছে। তাই বলছি, কংগ্রেস দলের আজ বোঝার সময় এসেছে এই পরিবার এমনই একটি বিষম বোঝা। দল যদি সত্যিই টিকে থাকতে চায় তাহলে অতি বিলম্বে এই পারিবারিক বোঝাটিকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।

শুধু কি সোনিয়া?

অবশ্য শুধু সোনিয়া গান্ধীকে দুরমুশ নয়, হতভাগ্য মনমোহনের কথাও একটু বলতে হবে। বেচারী সেই গোয়া অবধি ছুটে গিয়েছিলেন। আমার আরও বলবার যে গোয়ার পাঞ্জিম থেকে মাত্র ৩০ মাইল দূরে আমার নিজের গ্রামে মনমোহনজীর বক্তব্য রাখার কথা ছিল। পরিতাপের বিষয় দেখুন, সম্ভাব্য ভোটাররা দলবদ্ধভাবে সভাস্থলে জড়ো হয়। যাতে মনমোহনজী তাঁর বক্তৃতা না চালাতে পারেন সেটি নিশ্চিত করতে। মাইকের তার শুধু নয় বিদ্যুৎ সরবরাহ পর্যন্ত তারা সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। হতভাগ্য মনমোহন কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর সেখানে আর কোনও শ্রোতা ছিল না। জানিয়ে রাখি, আমার গ্রাম থেকে একজন বিজেপি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন আর সারা গোয়াতেই মানুষ কংগ্রেসকে নখদন্তহীন একটি জড় পদার্থে রূপান্তরিত করেছে। আমার মনে হয়, কংগ্রেসের এই পতিত অবস্থার জন্যে চারটি লোক দায়ী— (১) সোনিয়া গান্ধী, (২) মনমোহন সিং, (৩) আন্না হাজারে এবং (৪) বাবা রামদেব। এই প্রসঙ্গে আমরা শেষোক্ত দুই প্রবীণের ভূমিকাকে যেন খাটো করে না দেখি। আন্না মাঠে না নামা পর্যন্ত দুর্নীতিকে দেশে একটা ছোটখাট ব্যারাম বলেই লোকে মনে করত। কিন্তু এখন এটাকে প্লেগের মতো মহামারী বলে ভাবছে। আন্না এবং বাবা রামদেব দুর্নীতিকে একদম লোকচক্ষুর সামনে এনে এটিকে জ্বলন্ত রাজনৈতিক বিষয়ের চেহারা দিয়েছেন। লক্ষ্য করতে হবে এই আন্দোলনের পরের নির্বাচনগুলি সবই দুর্নীতির বিপদকে ঘিরে হয়েছে, যেগুলিকে সোনিয়া গান্ধী সব সময়ই বস্তাবন্দী করে গোডাউনে ফেলে রাখতে চাইছিলেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সর্বদাই কিছুই না জানার ভান করে নাবালক শিশুর মতো আচরণ করে গেছেন। দুম করে স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারী নেপথ্যে থাকা এ. রাজা ও চিদাম্বরম যুগলকে 'ক্লিন চিট' দিয়ে দিলেন। মনে রাখতে হবে সুরেশ কালমাডির মতো

একজন জালিয়াত এখনও দিল্লীর আমলা মহলে বিচরণ করছে। একই প্রজাতির কৃপাশঙ্কর সিং নামে ইউপি'র এক কলাওয়ালা সুদূর মুম্বাই গিয়ে সেখানকার— বাদশা বনে গেছে। এ ব্যাপারে মনমোহনজী কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? কিচ্ছু না। অন্য দিকে ধূর্ত রাহুল গান্ধী একটা অন্য খেলায় নামেন। তাঁর পেছন পেছন তোল্লাই দিতে মিডিয়াও ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি এমন একটা ভান করতে শুরু করেন যেন তিনি একজন হঠাৎ গজানো ধোয়া তুলসীপাতা। তাঁর মায়ের দিল্লীর সাঙ্গপাঙ্গোদের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, দুর্নীতি তো দূরস্থান। হঠাৎ দেখলে মনে হবে হয়তো হিপি সম্প্রদায়ের কোনও নবীন বালখিল্য উত্তরপ্রদেশের অলিগলিতে ঘুরছেন। কোথাও বসে পড়ে অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ডাল-ভাত খাচ্ছেন। মজার কথা তাঁর নজর কিন্তু সব সময় আছে নিকটবর্তী পাঁচ তারা হোটেলের দিকে যেখান থেকে ওই কৃচ্ছ্রসাধনের খানা সরবরাহ হয়েছে! কিন্তু এত করেও তিনি উত্তরপ্রদেশের গরিবগুর্বো মানুষগুলোকে বোকা বানাতে পারলেন না। বিধির বিধানে শতাব্দী ধরে যারা নিঃসীম দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছে আর দেখেছে গান্ধী-নেহরুর পরিবার দিল্লীতে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। যে মুহূর্তে তারা সঠিক সুযোগ পেয়েছে, তখনই এই চতুর ধড়িবাজদের ঢাকি-ঢুলি সমেত উত্তরপ্রদেশের মাটি ছাড়া করেছে। অশৌচ আক্রান্তের মতো দাড়ি রাখা এই হতমান ব্যক্তিটি পত্রপাঠ দিল্লীর জনপথে পালিয়েছেন। কিন্তু এই বিতাড়ন থেকে কোনও শিক্ষা পেয়েছেন বলে মনে হয় না।

ক্রিশ্চানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা :

পরিবারটির ওপর ভোটাররা এতটাই হতাশ ও বীতশ্রদ্ধ ছিল যে তারা যেখানেই কোনও কংগ্রেসীকে পেয়েছে ভোটবাক্সে তাকে কচুকাটা করেছে। গোয়াতে কিছু কিছু পরিবার তাদের দিল্লীর ধর্মমাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অধিকাংশ বিধানসভা আসনের ওপর দখল নিয়ে বসে। ভাই-ভাগ্নে, ছানাপোনা সবাইকে দাঁড় করিয়ে ভেবেছিল দিল্লীর পরিবারের মতো তাদের ছেলেপুলেরাও উত্তরাধিকার বহন করার হকদার। এক প্রাক্তন ক্যাথলিক কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পরিবারের সকলকে টিকিট দিলেও সবাই-ই গো-হারান হারে। কারো, কারো জমানত অবধি জব্দ হয়ে যায়। অপরপক্ষে বিজেপি ৬ জন ক্যাথলিককে প্রার্থী করেছিল, তারা সকলেই জিতেছে। লক্ষ্য করার বিষয়, গোয়ার বিজেপি সব সম্প্রদায়ের সমর্থন পেয়েছে, বিশেষ করে খৃস্টান ও মুসলমানদের। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী সলমন খুরশিদ তাঁর খৃস্টান স্ত্রীকে প্রার্থী করলেও তিনি জামানত খুইয়েছেন আশা করা যায়। তাকে আর দেখা যাবে না। একই সঙ্গে মুসলমানদের বোকা বানাতে তিনি চটজলদি নানান সংরক্ষণের টোপ ফেঁদেছিলেন। আইনমন্ত্রীর সব ঘোষণাগুলিই ছিল বেআইনী।

দুর্নীতি ও কংগ্রেসী দৃষ্টিভঙ্গী :

আজকের ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দু' স্তরেই দুর্নীতিকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে দিয়েছে। একটি ছাড়া আর একটিকে ভাবা যায় না। যে কারণে অনেক কংগ্রেস নেতাই আজকাল বলেন যে কোনও মেশিন চালু রাখতে গেলে যেমন লুব্রিক্যান্টের দরকার হয়, সেরকম দেশ চালাতে দুর্নীতি। এটা না থাকলে দেশের কাঠামোটাই ভেঙ্গে পড়বে। দেশ অচল হয়ে যাবে। সত্যি কথা বলতে কি সোনিয়া অ্যান্ড কোং একটি নিখুঁত বিজনেস মডেল খাড়া করেছেন যেটিকে আমি পিএমপি মডেল বলব। আর এটিকে বিজনেস মডেল বলার কারণ হলো— রাজনীতি এমনই একটি বিশাল কারবারের আকার ধারণ করেছে। অবাক হবেন না, লেনদেনের মাপকাঠিতে দেখা যাবে বস্ত্র বা ইস্পাত তো বটেই এটি আই টি শিল্পের বিজনেস পরিসংখ্যানকেও হয়তো ছাড়িয়ে যাবে। এই অতি সফল পি এম পি মডেলে আপনি প্রথমেই যেনতেনপ্রকারেণ 'পি' অর্থে (পাওয়ার) প্রয়োগ করে টাকা রোজগার করুন। আবার সেই টাকার যথাস্থানে সদ্ব্যবহার করে আরও 'পি' অর্থাৎ ক্ষমতা কুক্ষিগত করুন। এই মডেলটি সরাসরি বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের ঘরানায় তৈরি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে অচিরেই এটি হার্ভাডের সিলেবাসের মধ্যে ঢুকে যাবে, বিশেষত যে বিভাগগুলোতে ভারতীয় পড়ুয়াদের চাহিদা বেশি। বিশ্বাস করুন, আমার ধারণা এই অসাধারণ মডেলটি প্রথমে ইটালিতেই আবিষ্কৃত হয় ও সেখানেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। মাথায় রাখতে হবে পৃথিবীর মধ্যে ইটালিই সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। ইটালি থেকেই এই দুর্নীতির মডেল ভারতে আমদানী করা হয় প্রায় ১০-১৫ বছর আগে। মাফ করবেন, ঠিক কে এটি আমদানী করেছে বা কেমন করেই বা এটি ভারতে ছাড়পত্র পেল এ প্রশ্ন আমাকে করবেন না। তবে হ্যাঁ, যাঁরা এটিকে প্রয়োগ করেছেন বা করে যাচ্ছেন তাঁরা এখনও পর্যন্ত এর আশ্চর্য সুফল হাতে হাতে ভোগ করছেন। আপনি বলতে পারেন আমি 'এখনও পর্যন্ত' কথাটা কেন বললাম। তার কারণ কেউ কিন্তু জানে না কতদিন পর্যন্ত মডেলটি ফল দিতে পারবে। ভারত কিন্তু সেই চিরাচরিত ভারত আর নেই। আমাদের চোখের সামনেই দিনের দিন তা বদলে যাচ্ছে। এই নতুন জাগ্রত ভারতবাসীর কাছে এই ইটালীয় ব্যবসায়িক মডেলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাও থাকতে পারে। খেয়াল রাখা দরকার, অর্থনীতির ব্যাপক উন্নতির ফলে একটি নতুন বিত্তবান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। এরা আর শুধু নিত্য নতুন গাড়ি, বাড়ি, টেলিভিশন কিনে পরিতৃপ্ত থাকতে পারছে না। তারা অন্যভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর সেই লক্ষ্যে তারা যথেষ্ট রাজনৈতিক সমর্থন আদায় করতেও সক্ষম। এই নতুন প্রজাতি রেজাল্ট বা ফলে বিশ্বাসী। তারা কাল বা পরশু নয়, আজকেই হাতে-গরম ফলাফল দেখতে চায়। তাদেরই সঞ্চিত যে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে তা থেকে তারা চটজলদি লাভ পেতে চায়। এই নব উন্মোচিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে সরকারগুলিকেই টলিয়ে দিচ্ছে। এরাই আরব-বসন্তের নামে মধ্যপ্রাচ্যে যে সাম্প্রতিক উথাল-পাথাল হয়ে গেল বা গত মাসের ভোটে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুটিনের নির্বাচনে প্রায় বিধ্বস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল তার মুখ্য কারিগর। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীই গোয়ার জালিয়াত কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের দুর্নীতিতে ডোবা মায়াবতী সরকারকেও তাড়িয়ে ছেড়েছে। ঠিক একইভাবে এই মধ্যবিত্তরাই আজ থেকে দু' বছরের মধ্যে গেঁড়ে বসা গান্ধী পরিবার ও তার ততোধিক নোংরা বিজনেস মডেলটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। এখন দরকার একটু ধৈর্য। আমরা শুরুটা দেখলাম। নিশ্চিত সমাপ্তিটাও দেখতে হবে বৈ কি!

(লেখক বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক ও অর্থনীতিবিদ।)

“সেদিন আমরা একত্র হইনি—আজও নয়”

“কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।”

[কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—‘স্বামী শ্রদ্ধানন্দ’ প্রবন্ধ—মাঘ ১৩৩৩]

সৌজন্য : জনৈক শুভানুধ্যায়ী

৩৩, গোরাচাঁদ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০৬

১৯৪৭-এর দেশ ভাগের কারণ এবং ইসলামের মূল বক্তব্য সম্পর্কে শ্রী দেবজ্যোতি রায়ের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

১। কেন উদ্বাস্তু হতে হল, (৩য় সং, ৮০ টাকা) ২। ইসলাম ও বিশ্বশান্তি, (১৫ টাকা) ৩। মহাত্মা মহম্মদ ও তাঁর উপদেশ, (২য় সং, ১৫ টাকা) ৪। যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে সর্বধর্ম সমন্বয়, (১৫ টাকা) ৫। ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ : একটি সর্বনাশা পদক্ষেপ, (১২ টাকা) ৬। মুসলিম রাজনীতি ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ, (১২ টাকা) ৭। অহিংস তত্ত্ব, আত্মরক্ষা ও দেশ রক্ষা, (১২ টাকা)।

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০ ০৭৩

২। বারাসাত রেলওয়ে বুক স্টল, কলকাতা-৭০০ ১২৪

৩। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ফোন : ০৩৪৮-২২৬৪২৫৩

নেত্রদান মহাদান

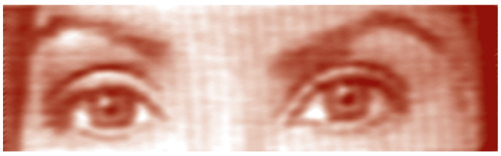

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

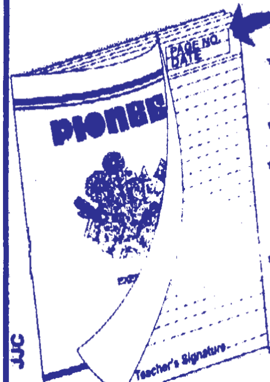

- প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
- পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
- আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
- ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
- প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
- ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
- প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature........................ কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

ব্যাঙ্গালোর, মুম্বাইয়ের পর এবার দিল্লীও বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ব্যাঙ্গালোর তো ছিলই। মুম্বাইয়ের পর এবার দিল্লী। রাজ্যে (দিল্লী) এবং কেন্দ্রে (নতুন দিল্লী) ক্ষমতায় লাগাতার আসীন থাকা সত্ত্বেও দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (এম সি ডি) নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি দারুণ জয়লাভ করেছে। গত ১৫ এপ্রিলের পুর নির্বাচনে মোট ২৭২টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ১৩৮টি। এই ফলাফলে বিজেপি'র শীর্ষ নেতারা যতটা উল্লসিত, কংগ্রেস নেতারা ততটাই মূহ্যমান। তবে প্রকাশ্যে দু'চারজন কংগ্রেস নেতা নানা যুক্তির অবতারণা করছেন। যেমন, এটা স্থানীয় নির্বাচন, একবছর বাদে দিল্লী বিধানসভা বা পরের লোকসভা নির্বাচনে এর কোনও প্রভাব পড়বে না প্রভৃতি।

পাঁচবছর হাতছাড়া দিল্লী কর্পোরেশন পুনরুদ্ধার করতে দিল্লী প্রদেশ কংগ্রেস এবং শীলা দীক্ষিত সরকার অনেক আটঘাট বেঁধেই নির্বাচনে নেমেছিল। অনেক তাবড় নেতা-নেত্রীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও শীলা দীক্ষিত সরকার দিল্লী কর্পোরেশনকে ভেঙে তিন টুকরো করেন— উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিল্লী। অবশ্য তিনটি ক্ষেত্রেই বিজেপি এককভাবে সর্বাধিক আসনে জয়লাভ করেছে।

এর ফলে, লাগাতার চৌদ্দ বছরের বেশি সময় ধরে রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা শীলা দীক্ষিতের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। অবশ্য শীলা দীক্ষিতদের যুক্তি ২০০৭ সালেও বিজেপি দিল্লী কর্পোরেশন দখল করেছিল ১৬৪টি আসনে জিতে। তা সত্ত্বেও ২০০৯-এর সংসদীয় নির্বাচনে কংগ্রেস সার্বিক সাফল্যলাভ করেছিল। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ওটা একেবারে ছেঁদো যুক্তি। কেননা ভারতীয় জনতা পার্টি এবার প্রচারে দুর্নীতি ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির মতো সর্বভারতীয় বিষয়কেই ইস্যু করেছিল। বিজেপির দিল্লী রাজ্য সভাপতি বিজেন্দর সিংহ এবং দলীয় সভাপতি নীতিন গডকরিরা তাই মনে করেন। সেজন্য তারা আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত এই প্রচারকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চান।

উত্তর দিল্লীতে বিজেপি মোট ১০৪টি আসনের মধ্যে ৫৯ আসনে জয়লাভ করেছে। কংগ্রেস সেখানে ২৯ আসন জিতে অনেকটাই পিছনে। তবে কংগ্রেসের করুণ অবস্থা পূর্ব

দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন : নির্বাচনী ফলাফল—২০১২

উত্তর দিল্লী	
মোট ওয়ার্ড—১০৪	
বিজেপি—	৫৯
কংগ্রেস—	২৯
বি এস পি—	৭
অন্যান্য—	৯
দক্ষিণ দিল্লী	
মোট ওয়ার্ড—১০৪	
বিজেপি—	৪৪
কংগ্রেস—	৩০
বি এস পি—	৫
অন্যান্য—	২৫
পূর্ব দিল্লী	
মোট ওয়ার্ড—৬৪	
বিজেপি—	৩৫
কংগ্রেস—	১৯
বি এস পি—	৩
অন্যান্য—	৭

দিল্লীতে। ওখানের সাংসদ আবার শীলা দীক্ষিতের পুত্র সন্দীপ। মোট আসন ৬৪টি। বিজেপি পেয়েছে ৩৫টি আসন। আর কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ১৯টি আসন।

দক্ষিণ দিল্লীতে ১০৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৪৪টি, কংগ্রেস ৩০টি এবং অন্যান্যরা ২৫টি আসনে জয়লাভ করেছে। কংগ্রেস এবার নিশ্চিত ছিল যে, টিকিট বন্টনে বিজেপি'র ব্যাপক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কর্পোরেশনের অপশাসনের দৌলতে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার জেরে দল শেষ পর্যন্ত বাজিমাৎ করবে। শীলা দীক্ষিতের দিল্লী কর্পোরেশনকে ত্রিধা-বিভক্ত করার বিষয়ে দলের বিভিন্ন স্তর থেকে দারুণ বিরোধিতা হয়েছিল। কিন্তু তিনি মানেননি। ৫৩ বছরের প্রাচীন কর্পোরেশনকে তিন টুকরো করেছিলেন। শীলাজী নিজে দিল্লীর এমাথা-ওমাথা চষে বেড়িয়ে জনসভাও করেছিলেন। তাতে যে বিশেষ লাভ হয়নি তা ফলেই প্রমাণিত।

বেশ কয়েকজন নতুন নক্ষত্রের উদয় অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপি দলের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হতে চলেছে। অবিভক্ত দিল্লী কর্পোরেশনের মেয়র রজনী আব্বি, ডেপুটি মেয়র অনিল শর্মা, প্রাক্তন মেয়র মীরা আগরওয়াল, বিজেপি'র দিল্লী শাখার সাধারণ সম্পাদক আশিস সূদ, সভাপতি বিজেন্দর গুপ্ত এবং তাঁর ধর্মপত্নী শোভা বিজেন্দর-এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। শোভা বিজেন্দর রোহিণী এলাকা থেকে ৮,৭৫০ ভোটের ব্যবধানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের মণিকা পুরীকে হারিয়েছেন। সর্বাধিক ১৭,০০০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী জগ রোশনী। তাঁর পরেই আছেন সতবিন্দর কৌর সিরসা। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের প্রেমসুরেশ যাদবকে ১১,৫৮৪ ভোটের বিরাট ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। তিনিই একমাত্র কোটিপতি প্রার্থী, হিসাব দাখিল করেছেন ১১২ কোটি মূল্যের সম্পদের।

প্রবীণ বিজেপি নেতা বিজয়কুমার মালহোত্রা বিজেপির সাফল্যকে শীলা দীক্ষিতের অপশাসনের বিরুদ্ধে জনাদেশের প্রতিফলন বলে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করেছেন। তিনি বলেছেন, শ্রীমতী দীক্ষিতের নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে পরাজয় স্বীকার করে পদত্যাগ করা উচিত।

বিজেন্দর গুপ্ত বলেছেন, বিজেপি প্রশাসনে স্বচ্ছতা এবং জবাবদায়ী হয়ে কাজ করে। সেজন্য জনগণ তাদেরকে সমর্থন করেছেন। এতসব কিছু সত্ত্বেও সামান্য খুঁত থেকে গিয়েছে। ২০০৭-এর তুলনায় এবার বিজেপি-র ২৪টি আসন কমেছে আর কংগ্রেসের আসনসংখ্যা ১১টি বেড়ে ৬৭ থেকে ৭৮ হয়েছে।

চোরাকারবারিদের রমরমা মালদার কালিয়াচক সীমান্তে

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ মালদা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া থাকা সত্ত্বেও চোরাকারবার, অনুপ্রবেশ, গোরুপাচার কিংবা ড্রাগ পাচার বন্ধ হয়নি। সম্প্রতি কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ চরিঅনন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মহব্বতপুর গ্রামে চোরাকারবারিদের দাপটে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন গ্রামবাসীরা। মুসলমান অধ্যুষিত এই গ্রামটিতে পুলিশ ও বি এস এফ চোরা-কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেই দুষ্কৃতীরা গ্রামবাসীদের সন্দেহ এবং তাদের না কি আক্রমণ করছে বলে অভিযোগ। এই এলাকায় বেআইনী অস্ত্রও প্রচুর রয়েছে। ফলে গ্রামবাসীরা নিরাপত্তার অভাববোধ করে বি এস এফের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। বি এস এফের মালদা ফ্রন্টিয়ারে কমান্ড্যান্ট মধুকর জানিয়েছেন, মহবতপুর গ্রামে বহু মানুষ বসবাস করেন, বেশিরভাগ মানুষই চোরা-কারবারের সঙ্গে যুক্ত। কে ভাল আর কে মন্দ তা বোঝা খুব মুশকিল। পুলিশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে অভিযান চালানোর সময় আমাদের সহযোগিতা চাইলে আমরা তাদের সহযোগিতা করছি। তবে চোরাকারবারিরা এখন যে ভাবে গ্রামের মহিলা ও শিশুদের সামনে রেখে দুষ্কর্ম করার চেষ্টা করছে তা খুবই উদ্বেগজনক। এই পরিস্থিতির কীভাবে মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। বি এস এফের গোয়েন্দা বিভাগসূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে কালিয়াচক থানার এই মহব্বতপুর গ্রামে জাল নোট কারবারি এক পান্ডাকে ধরার জন্য অভিযান চালায় বি এস এফের ১২৩ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা। সঙ্গে ছিল গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। কিন্তু ওই মুসলমান যুবক পরিবারের মহিলা ও শিশু সদস্যদের সাহায্যে বাধাদানের ফলে সে এলাকা থেকে পালাতে সক্ষম হয়। তার মতো আরও অনেক জাল নোট কারবারি এই ভাবে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে অবাধে দুষ্কর্ম করে চলেছে। গ্রামের বাসিন্দা আসিফ আলি, হায়েদ আলি, নিয়ামত শেখরা বলছেন, চোরাকারবারিরা না কি বাড়ির মধ্যে বোমা ফাটাচ্ছে। আবার পুলিশ চোরাকারবারিদের ধরতে এলে এরাই পুলিশকে বিভ্রান্ত করে মিথ্যা কথা বলছে, পাচারকারিদের পালাতে সাহায্য করে। এই গ্রামের ২০টি পরিবার চোরাকারবারিদের অত্যাচারে গ্রাম থেকে অন্য জায়গাতে চলে গেছে, নাকি নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে গ্রাম থেকে চলে গেছে সন্দেহ রয়েছে! জেলা পুলিশ সুপার জয়ন্ত পাল বলেন, গ্রামে চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে পুলিশ লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে তবে গ্রামবাসীরা চোরাকারবারিদের হাতে অত্যাচারিত হচ্ছে এমন অভিযোগ আমি পাইনি। এদিকে গত ১৫ এপ্রিল রবিবার ভোরে কালিয়াচক বৈষ্ণবনগর থানার দৌলতপুর গ্রামে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বি এস এফের গুলিতে বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জের ফারুক আলি (২৩) নামে এক গোরু পাচারকারিকে গুলি করে মেরে ফেলে বি এস এফ-এর ১২৫ নম্বর ব্যাটালিয়ানের জোয়ানরা। কাঁটা তারের বেড়া কেটে গোরু পাচার করার সময় বি এস এফ গুলি চালায় তখন পাচারকারিরাও গুলি চালায়। দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই চলার পর ওই দুষ্কৃতীর মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য, বি এস এফের ওপর ক্রমাগত আক্রমণের ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই বি এস এফকে গুলি চালাতে হয়েছে। স্থানীয়সূত্রে জানা গেছে বেশ কিছুদিন থেকে চোরাকারবারিরা খুব সক্রিয় ছিল। এখনও এলাকায় চাপা আগুনের মতো উত্তেজনা রয়েছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

ম্যাট লী'র দেশলাই বাক্স প্রেম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অস্ট্রেলীয় ম্যাট লী'র ভারতপ্রেমের কারণটি বিচিত্র। এমনিতে অস্ট্রেলিয়ায় জাতিদাঙ্গার প্রভাব এতটাই গুরুতর যে কোনও অস্ট্রেলীয় যে ভারতপ্রেমিক হতে পারে, তা অতিবড় ভারত-শত্রুও বিশ্বাস করবে না। তবুও ম্যাট লী ব্যতিক্রমী। পেশায়

লী'র সংগ্রহে কিছু উল্লেখযোগ্য দেশলাই বাক্স। (ইনসেটে ম্যাট লী)

শিল্পী। এত কিছু থাকতে তিনি এদেশের দেশলাইয়ের প্রেমে পড়ে গেছেন। এবং তাঁর ভারত-প্রেমে দুর্বলতম স্থানটি এখন দেশলাই-ই। ২০০৭-এর ঘটনা। ব্যক্তিগত কাজে লন্ডন থেকে এসেছিলেন ব্যাঙ্গালোরে। সেখানে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে দেশলাই বাক্সের দিকে চোখ পড়ল তাঁর। দেশলাই বাক্সের গায়ে আঁকা (শিল্পীর পরিভাষায় ইলাসট্রেশান) ঘাতক তিমির ছবি, আর তার তলায় ক্যাপশন লেখা 'ডলফিন'। তাঁকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করল ব্যাপারটা। তিনি কিনে নিলেন দেশলাইটি। শুরু হলো ভারতীয় দেশলাইয়ের সঙ্গে তাঁর পথ চলা।

সেই অবিরাম পথ চলা তাঁর এখনও ফুরোয়নি। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বিশেষত্ব-যুক্ত দেশলাই বাক্স তাঁর সংগ্রহে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি দেশলাই বাক্সের গায়ে আঁকা মানুষের চিত্র, গলায় ঝুলছে স্টেথিসস্কোপ। বোঝাই যায় যে মানুষটি পেশায় ডাক্তার। তলায় ক্যাপশন লেখা, 'ডক্টর : সেফটি ম্যাচেস।' এই দেশলাইটি লী সংগ্রহ করেছিলেন বারাণসী ঘাটের পেছনে এক সরু গলির মধ্যে অবস্থিত একটি চায়ের দোকান থেকে। লী-র সংগ্রহে অপর একটি দেশলাই বাক্স যেখানে অমিতাভ বচ্চনের কার্টুন ব্যবহৃত হয়েছে এবং যেখানে অমিতাভ তাঁর ছায়াছবি 'কুলি'র চরিত্র অনুকরণে পোশাক পরেছেন। ক্যাপশন দেওয়া হয়েছে ইংরেজিতে 'পোর্টার' এবং হিন্দীতে 'বড় সাইজ। এই দেশলাই বাক্সটি ব্যাঙ্গালোরের একটি সম্ভ্রান্ত পাড়ার দোকান থেকে সংগ্রহ করেন লী। হলুদ ও সবুজ রঙের আরেকটি দেশলাই বাক্সে ছবি রয়েছে কালো পিস্তলের ছবি। এই বাক্সটি অবশ্য লী'র উপহার পাওয়া। তাঁর একবন্ধু জয়পুরের রাস্তার ধারের একটা দোকান থেকে এই দেশলাই বাক্সটি কিনে তাঁকে উপহার দেন। এমন দেশলাই-বাক্স-পাগল লোককে উপহার দিতে গেলে নতুন ধরনের দেশলাই বাক্সের চেয়ে ভালো উপহার আর কি-ইবা হতে পারে! কেরলের কোচি দুর্গ থেকে কেনা তিলকের (কপালের ফোঁটা) চিত্র সম্বলিত লাল-নীল রঙের দেশলাই বাক্সও রয়েছে লী'র সংগ্রহের তালিকায়।

নিজে শিল্পী। দেশলাই বাক্সের মতো সামান্য (নাকি অসামান্য?) জিনিসের ওপর শিল্পকলা তাই স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তাঁর। কিন্তু সেই দেশলাই বাক্স নিয়ে জীবনের পাঁচটা মূল্যবান বছর কাটিয়ে দেবার পর সারাটা জীবনও এনিয়ে কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে, কিংবা দেশলাই বাক্সের খোঁজে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়ানো, অলি-গলি-গুঁজিতে হাতড়ে বেড়ানোটা 'অন্যরকম' বইকি!

With Best Compliments From :

S. L. Khemka

সফল কেরিয়ার গড়তে

স্থায়ী আয়ের এক সুবর্ণ সুযোগ!!!

মাধ্যমিক পাশ যে কোন ব্যক্তি/গৃহবধূ/বেকার ভাই-বোন/কলেজ ছাত্র-ছাত্রীরা স্থায়ী আয়সহ জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে সত্বর যোগাযোগ করুন।

ভারত সরকারের ১নং অর্থনৈতিক সংস্থা L.I.C.-র অন্যতম Chief Adviser

সোমক ব্যানার্জী — মোবাইল—৯৮৩০৪১১৬৩৫

আপনি জানেন কি??

L.I.C. তার এজেন্টদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে তা সাধারণ কোন সরকারী বা বেসরকারী চাকুরিজীবিদের থেকে অনেক বেশি।

L.I.C.-র এজেন্টদের সুযোগ-সুবিধার কিছু অংশ

- নির্দিষ্ট একটা আয়
- গ্রাচুইটি (২ লক্ষ টাকা)
- পেনশন
- প্রতি বছর গ্যারান্টি বোনাস
- টার্ম ইনসিওরেন্স (২ লক্ষ টাকা)
- গৃহঋণ (নামমাত্র সুদের হারে)
- গাড়ি/মোটর সাইকেল কেনার জন্য ঋণ (বিনা সুদের হারে)
- ছেলে-মেয়ের জন্মদিন বা বিবাহের জন্য অগ্রিম অর্থ।

"এজেন্সী প্রফেশন" জীবনের লক্ষ থাকে না, কিন্তু এই প্রফেশন জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে।

দ্বিধা দ্বন্দ্ব জীবনে প্রতিষ্ঠার বড় বাধা।

Padam Kumar Shyamsukha

2, Lalbazar Street, Room No. - 111

Kolkata - 700001

Phone : 2210-1833 (O), 2359-2126 (R)

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো

বাংলা ভাষায় এই প্রথম জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গাঁধিজীর সম্পূর্ণ জীবনী

রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের

মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী

একটি অকপট জীবনী, ১৫০

পোরবন্দর থেকে শুরু হওয়া গাঁধিজীর জীবন শেষ হয়েছিল রাজঘাটে। নানা বৈপরীত্যে ভরা ছিল সেই জীবন; সেই সব বৈপরীত্য নিয়েই রচিত এই ঐতিহাসিক জীবনী যা আপনাকে দ্রুতলয়ে টেনে নিয়ে যাবে শুরু থেকে শেষে। কোনও জীবনই একহারা নয়, প্রতিটি জীবনেই আছে নানা টানাপোড়েন, আপনি পৌঁছবেন এই সত্যে।

তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, M-9830532858

সঙ্ঘ-জননী শ্রীশ্রীমণিকুন্তলা দেবীর

১১৩তম শুভ জন্মোৎসব

ভগবদ্ভক্তে(ষু,

আগামী ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯ সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর মহোদয়ের সহধর্মিণী সঙ্ঘ-মাতা শ্রীশ্রীমণিকুন্তলা দেবীর ১১৩তম জন্মোৎসব।

আপনি সবান্ধব উৎসবে যোগদান করে উৎসবের আনন্দবর্ধন করবেন। ইতি—

—ঃ মাতৃসেবক ঃ—

ব্রহ্মচারী ঋতেন ভাই
সংঘ সভাপতি
২৫৬৪-৭৯৪২

ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই
সংঘ সাধারণ সম্পাদক ও ট্রাস্টী
২৫৬৪-৫৫৫৩/৬৯৯৯

॥ সঙ্ঘ পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহ॥

 অনাথ ও দুঃস্থ বালকদের জন্য আদ্যাপীঠ বালকাশ্রম। অনাথা ও দুঃস্থা বালিকাদের জন্য দ(ি ণেশ্বের বালিকাশ্রম। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জন্য পৃথক পৃথক বাণপ্রস্থ আশ্রম। পৃথক পৃথক সাধক-সাধিকা আশ্রম। স্বামী পুত্রহীনা বিধবা মায়েদের জন্য মাতৃআশ্রম। দৈনিক প্রায় পাঁচশত দরিদ্রনারায়ণের সেবা। দাতব্য চিকিৎসালয় (ভ্রাম্যমাণ মোবাইল ডিস্‌পেনসারি, আম্বুলেন্স সার্ভিস, X-Ray ক্লিনিক, E. C. G. ক্লিনিক, দন্ত ও চ(ু বিভাগ, E. E. G. & আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, প্যাথলজি সবরকম পরী(া, ফিজিওথেরাপি, দাঁতের সমস্ত চিকিৎসা ও দাঁত বাঁধানো হয়। সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়। মণিকুন্তলা বালিকা বিদ্যালয় (প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক)। মা-মণি শিশুনিকেতন। অতিথিভবন।

 শীঘ্রই বি এড কলেজ শু(হতে চলেছে।

সঙ্ঘে যেকোনও দান আয়কর মুক্ত(ঃ আপনার দান চেক-এ পাঠালে এই নামে ও ঠিকানায় পাঠাবেন—
"Dakshineswar Ramkrishna Sangha Adyapeath" Kolkata-700 076 (West Bengal) Phone : 2564-5553/6999.

প্রজ্ঞা সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন শ্রীযোগেন্দ্রজী

এবছর ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন সংস্কার ভারতীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযোগেন্দ্রজী শ্রীবাস্তব। ২৯ এপ্রিল, রবিবার, সকাল ১০টায়, মহাজাতি সদনের মূল প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠানে এই সম্মান জানানো হবে। আয়োজক সংস্থা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

হিন্দু বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে স্মারকলিপি

গত ১৬ এপ্রিল হিন্দুবিরোধী রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে আট দফা দাবি নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মালদা জেলার পক্ষ থেকে মালদা শহরের এল আই সি মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ, ধর্না এবং জেলাশাসকের কাছে এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

দাবিগুলি ছিল :

(১) ওবিসি সংরক্ষণ ২৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২২.৫ শতাংশ করে দেওয়া এবং কমে যাওয়া ৪.৫ শতাংশ সংরক্ষণ মুসলমানদের দেওয়া চলবে না। (২) হিন্দুদের করের টাকায় ৭২ লক্ষ মুসলমান ছাত্রের বেতন দেওয়া যাবে না। (৩) মুসলমান ছাত্রদের ৭০০ কোটি টাকা শিক্ষার জন্য দেওয়া বন্ধ করতে হবে। (৪) কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য ৬ শতাংশ হারে সুদ দিয়ে ব্যবসা করতে দেওয়া যাবে না। (৫) চাকুরীতে ১৫ শতাংশ হারে মুসলমান সংরক্ষণের প্রস্তাব বাতিল করা। (৬) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী আইন বাতিল করা। (৭) গো-পাচার ও গো-মাংস রপ্তানীর বিরুদ্ধে কঠোর আইন। (৮) ইমামদের মাসিক আড়াই হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার সরকারি ফরমান বাতিল করা।

সমাবেশ সমাচার

'সেবা চেতনা'-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

গত ১৫ এপ্রিল কলকাতার কেশব ভবনে সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের যান্মাসিক মুখপত্র 'সেবা চেতনা'-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হলো। বইটির আবরণ উন্মোচন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক তথা অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য শ্রীকৃষ্ণরাও মোতলগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবা ভারতীর সভাপতি সীতেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, আর এস এসের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুলচন্দ্র বিশ্বাস, প্রান্ত সেবা প্রমুখ মনোজ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। উন্মোচিত পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে দৃষ্টিনন্দন।

মেদিনীপুর শহরে মহাবীর পুজো

গত ৩ এপ্রিল মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দির প্রাঙ্গণে "হনুমৎশক্তি জাগরণ সমিতি" মেদিনীপুর প্রখণ্ড-এর ব্যবস্থাপনায় মহাবীর পূজার আয়োজন করা হয়। সমিতি সম্পাদক রঞ্জিৎ মাজীর তত্ত্বাবধানে পূজাপাঠ, বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ, ধর্ম্মালোচনা সহ সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে বজরঙ্গ দলের সহ প্রমুখ মলয় দাসের উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে লাঠিখেলার আখড়া বের হয়। তাদের মধ্যে ৬টি আখড়া পূজাস্থানে এসে তাদের ক্রীড়া শৈলী প্রদর্শন করে। অন্য আখড়াগুলি শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে। সম্পাদক শ্রী মাজী ব্যক্তিগত ভাবে ৬টি আখড়াকে পুরস্কৃত করার কথা ঘোষণা করেন। ধর্মসভায় বিভিন্ন বক্তাগণ হিন্দুসমাজকে মতাদর্শগত পার্থক্য বিভেদ দূর করে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালনা করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের 'নীলকণ্ঠজী মহারাজ'।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

গত ৮ এপ্রিল কলকাতার গড়িয়া গাঙ্গুলিবাগানে পরমার্থ সাধক সঙ্ঘের আশ্রমে সমাজ সেবা ভারতীর গড়িয়া শাখার উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন হয়। মঠাধ্যক্ষ ব্রহ্মাত্মাপুরী মহারাজের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানে আশ্রমবাসী ১৪ জন বালক সহ মোট ২১ জনের স্বাস্থ্যপরীক্ষা হয়। এবং প্রত্যেককে চিকিৎসকের পরামর্শ সম্বলিত হেলথ কার্ড দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ডাঃ বিমান সরকার ও ডাঃ শম্ভু মজুমদার। আশ্রমবাসীদের অনুসারী চিকিৎসার সুবিধার্থে শাখার পক্ষ থেকে সীতেশ ভট্টাচার্য এক হাজার টাকা প্রদান করেন।

চলে গেলেন শ্যামাপ্রসাদের একমাত্র জীবিতা কন্যাসন্তানও

ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র জীবিত সন্তান ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী আরতি ভট্টাচার্য সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন তাঁর আমেরিকার নিউইয়র্কের কুইনস রেগো পার্কস্থিত বাসভবনে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। একমাত্র পুত্রসন্তান নিউইয়র্কের একটি সংস্থার আইনজীবী সন্দীপের সঙ্গে থাকতেন তিনি আমেরিকায়। ২০০৫-এ তাঁর স্বামী পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পরেশ ভট্টাচার্য পরলোকগমন করেন। তাঁরা প্রায় ৫০ বছর ধরে নিউইয়র্কের বাসিন্দা। গত বছর মহারাষ্ট্রের পুণায় আরতিদেবীর দিদি সবিতা মারা যান। তাঁর দুই সহোদর অনুতোষ ও দেবতোষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন আগেই।

বলাগড়ে ইমামভাতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

হুগলি জেলায় ভারতীয় জনতা কিষাণ মোর্চা (বলাগড় মণ্ডল) এবং বিজেপি-র সোমড়া ২নং অঞ্চল ও বলাগড় অঞ্চল শাখার যৌথ উদ্যোগে মসজিদের ইমামদের মাসিক আড়াই হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ১০ এপ্রিল সোমড়া স্টেশনবাজার এবং ১১ এপ্রিল বলাগড় শ্রীপুর বাজারে দু'টি প্রতিবাদ বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। মূলত শিক্ষিত মুসলমান যুবক-যুবতীরাই এই সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোচ্চার হন। তাঁদের বক্তব্য, সরকারের এই সিদ্ধান্তে গ্রাম-বাংলার পৌনে তিন কোটি মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নতি সম্ভব নয়।

ভারতমাতা পূজা

গত ৩০ মার্চ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সুন্দরবন জেলার কুলতলী খণ্ডের দিঘির পাড় শাখার উদ্যোগে গ্রামের তরুণ যুবকদের সহযোগিতায় ভারতমাতার পূজার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। খণ্ডের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বালক ও তরুণদের খো-খো প্রতিযোগিতা, মায়েদের মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৫টায় প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগ প্রমুখ সনাতন মাহাতো।

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সম্পর্ক প্রমুখ পৃথ্বীশ পত্রনবীশ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা বিভাগ প্রচারক বিজয় পাতর এবং সুন্দরবন জেলা প্রচারক অমিত সরকার।

প্রধানাচার্য চাই

সারদা শিশুতীর্থ, সূর্যসেন কলোনী, শিলিগুড়ির (পূর্বোত্তর ক্ষেত্রে বিদ্যাভারতীর প্রথম বিদ্যালয়) জন্য প্রধানাচার্য চাই।

শিক্ষাগত ও অন্য যোগ্যতা—কমপক্ষে 'স্নাতক', আচার্য প্রশিক্ষণ প্রদত্ত। যে কোন শিশুতীর্থ বা শিশুমন্দিরে দশ বছর আচার্যরূপে কাজের অভিজ্ঞতা।

সরকারি পি. এফ. ই. এস. আই. সি-র সুযোগ সুবিধা সহ আবাস ব্যবস্থা থাকবে। যথা শীঘ্র আবেদনকারীকে নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদক,

সারদা শিশুতীর্থ

সূর্যসেন কলোনী, পোঃ—শিলিগুড়ি টাউন, পিন কোড—৭৩৪০০৪

দূরভাষ—(০৩৫৩) ২৬৯১৫৪৪, ৯৪৭৪৬৮৯৩৩১

যোগে রোগ মুক্তি

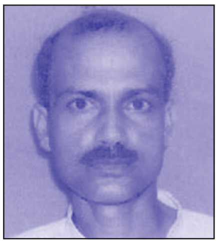

আশীষ পাল

কোষ্ঠবদ্ধতা

লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ এ ধরনের রোগের শিকার হচ্ছে। ক্রমশই রোগটা বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। কেবল বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাই নয়, এ রোগের শিকার হয়ে পড়েছে যুবক-যুবতীরাও। এমন কী কম বয়সী ছেলে-মেয়েরা কোষ্ঠবদ্ধতার শিকার হচ্ছে।

লক্ষণ : জিবের উপর ময়লা সঞ্চিত হওয়া, হঠাৎ মাথা ব্যথা, মাথাধরা, মুখে দুর্গন্ধ, তলপেটে ভারভার, অনিদ্রা, শারীরিক দুর্বলতা, খিটখিটে মেজাজ, ২/১ দিন বাদে মল ত্যাগ কোষ্ঠবদ্ধতার লক্ষণ।

রোগের কারণ : কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য বেশ কয়েকটি কারণ দায়ী করা যায়। যেমন অজীর্ণ, পরিশ্রম না করা, অধিক রাত্রে আহার করা, ঠাণ্ডা খাদ্যদ্রব্য খাওয়া, কম পরিমাণে জল পান করা। ভরপেট খাওয়া, অতিরিক্ত ঔষধ সেবন করা, রাত্রি জাগা, চা, পান, দোক্তা, মদ ও

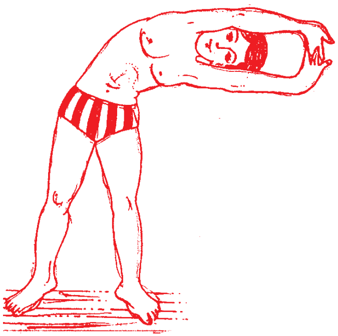

অন্যান্য নেশা সেবন, কঠিন খাদ্য ভালো ভাবে না চিবিয়ে খাওয়া, মলত্যাগের বেগ চেপে রাখা প্রভৃতি। যেসব কারণে কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয় মানুষ যদি ওইসব বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে তাহলে রোগটা হতে পারে না। কিম্বা হলেও অল্পেতেই সেরে যায়। কোষ্ঠবদ্ধতা থেকে মুক্তি লাভের উপায় হলো নিম্নরূপ।

প্রথম প্রয়োগ :

ভোরে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে বড় গ্লাসের ২ গ্লাস ঈষৎ গরম জলের সঙ্গে ছোট চা-চামচের ১ চামচ লবণ মিশিয়ে জল পান করুন। তারপর ঊর্ধ্বতাড়াসন ও পার্শ্বতাড়াসন ৬ থেকে ৮ বার করুন। এবং ১-২ মিনিট হাঁটুন বা পায়চারি করুন। বেশ কয়েকদিন করলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হবে এবং পেট পরিষ্কার হবে।

ঊর্ধ্বতাড়াসন বিভাগশ : (১) সোজা হয়ে দাঁড়ানো। পা দুটো জোড়া অবস্থায় অথবা ১ ফুট পায়ের অন্তর। (২) দু-হাতের আঙুল খুলে পরস্পরের মধ্যে ফাঁসিয়ে বা প্যাঁচ লাগিয়ে নাভির কাছে রাখা। (৩) পূর্ণ শ্বাস গ্রহণ করে হাত দুটো মাথার উপরের দিকে সোজা করে টান টান করতে হবে, ওই অবস্থায় তালু আকাশের দিকে পায়ের গোড়ালি দুটো একই সঙ্গে উপরে উঠবে। (৪) শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে নীচে হাত নাভির কাছে আশা অর্থাৎ পূর্বের স্থিতিতে গোড়ালি নীচের দিকে। এইভাবে ৬-৮ বার, তারপর পার্শ্বতাড়াসন করা।

পার্শ্বতাড়াসনের আগে ঊর্ধ্বতাড়াসনের মতো হাত দুটো মাথার ওপর নিয়ে গিয়ে দু

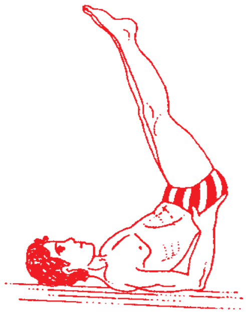

হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে ফাঁসিয়ে ওপরের দিকে স্থির করতে হবে। হাতের পাতা উপরের দিকে। পূর্ণ শ্বাস গ্রহণ করে ডান দিকে কোমর বাঁকানো ছবির মতো, আবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত দুটো মাথার ওপর নিয়ে আসা। এইভাবে বাঁ দিকে করা। এই কাজ ৬-৮ বার করা। তারপর ১-২ মিনিট পায়চারি করলে পায়খানার বেগ দেবে।

দ্বিতীয় প্রয়োগ : ভোরে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে এক লিটার ঈষৎ গরম জলের সঙ্গে মাঝারি মাপের আধখানা লেবুর রস এবং ছোট চা চামচের ১ চামচ লবণ মিশিয়ে সেই জল পান করুন। তারপর দেরী না করে ৩-৪ মিনিট বিপরীতকরণী মুদ্রা অভ্যাস করুন, তারপর ৫-৬ বার শলভাসন করুন। তা হলে পায়খানার বেগ দিবে এবং পেট পরিষ্কার হবে। এছাড়া, পবনমুক্তাসন, বিপরীতকরণী, ভুজঙ্গাসন, ধনুরাসন, যোগমুদ্রা, নৌকাসন, উড্ডাসন, অগ্নিসার ধৌতি আসন খুব ফলদায়ী।

নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক উপাচার ব্যবহার করতে পারেন। তবে পর্যায়ক্রমে এক একদিন একটি খাবেন। কারণ একটি জিনিস প্রতিদিন খেলে তা অভ্যাসে পরিণত হবে। পরে তাতেও আর কাজ হবে না।

১। ইসবকুলের ভুষি ২-৩ চামচ একটু চিনির সঙ্গে ঠাণ্ডা জলে গুলে রাত্রে খাওয়া।

২। কাঁচা বেল পুড়িয়ে সকালে সরবত।

৩। ত্রিফলার জল সকালে খালি পেটে।

৪। কালো তিল (খোসা ছাড়ানো) আখের গুড় এবং দুধ দিয়ে।

জাতীয় লিগ এবারও বোধহয় গোয়ায় যাচ্ছে

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতসেরা ক্লাব হিসেবে ডেম্পোর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। যোগ্যদল হিসেবে ডেম্পো জাতীয় লিগ জেতার দোরগোড়ায়। এই প্রতিবেদন লেখার সময় জাতীয় লিগের টেবলের দিকে তাকালে ডেম্পোকে সম্ভাব্য চাম্পিয়ন বলে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিরাট কোনও অঘটন না ঘটলে ডেম্পো পঞ্চমবারের মতো জাতীয় লিগ ঘরে তুলতে যাচ্ছে। যে রেকর্ড এদেশের আর কোনও ক্লাবের নেই। কলকাতার দুই প্রধান জুলজুল চোখে তাকিয়ে দেখছে ডেম্পোর অশ্বমেধের ঘোড়ার ঊর্ধ্বগতি, বহুমাত্রিক আধিপত্য। আর্মান্দো কোলাসো যে দেশের সেরা কোচ, তা আরও একবার প্রমাণিত। এহেন কোচকে একটি টুর্নামেন্টে ব্যর্থতার পরই প্রকারান্তরে ছেঁটে ফেলা হলো জাতীয়দল থেকে। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্যাভিও মেডেরাকে, যিনি কিনা ম্যান ম্যানেজমেন্ট থেকে স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ সবক্ষেত্রেই লোক হাসানো কারবার করে চলেছেন।

ডেম্পো ভারতীয় ফুটবলে ইউরোপীয় ক্লাব কালচার নিয়ে এসেছে খানিকটা হলেও। ইউরোপের বড় দলগুলি যেভাবে চালানো হয়, যেসব ব্যবস্থা, সুযোগ-সুবিধে সহযোগে এক একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। এদেশে ডেম্পো অনেকটা সেরকমভাবেই চালিত হয়। তার সুফল দেখা যাচ্ছে গত এক দশক করে। জাতীয় লিগ পাঁচবার জেতার পাশাপাশি একমাত্র ভারতীয় ক্লাব হিসেবে এশিয়ান ক্লাব চাম্পিয়নশিপে সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠেছে। পশ্চিম এশিয়ার শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে সমানতালে লড়ে সেমিফাইনালে ওঠা যথেষ্ট কৃতিত্বব্যঞ্জক। ডেম্পো কর্তারা এখন চিন্তাভাবনা করছে ইউরোপের কোনও বড় ক্লাবের অ্যাকাদেমির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে। যাতে উঠতি গোয়ানিজ ফুটবলাররা আরও সমৃদ্ধ হবে। আর তা যাতে চিরস্থায়ী হয়, ইস্টবেঙ্গল লেস্টার চুক্তির মতো অন্তঃসারশূন্য দশায় পর্যবসিত না হয়, সেটাও ভাবতে হবে। তবে ডেম্পো যেহেতু বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেট সংস্কৃতির আঙ্গিকে এই চুক্তি সম্পাদন হবে, যা ভারতীয় ফুটবলকে নতুন দিশা দেখাবে।

কলকাতার দুই বড় ক্লাব এখনও প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারল না। মোহনবাগান শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে সেই ১৯৮৯ সালে। ১২৩ বছরের প্রাচীন এই ক্লাব নামেই জাতীয় ক্লাব, চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণে এখনও সেই মান্ধাতার আমলে পড়ে রয়েছে। তার ওপর খেলোয়াড়-কোচ, কোচ-কর্মকর্তা সমন্বয়ের অভাব মাঝে মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে। সামান্য ব্যর্থতাতেই কোচকে জবাই করা হয়। এবছর সুব্রত ভট্টাচার্য যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে দল পরিচালনা করেছে। কিন্তু জাতীয় লিগে শেষ দিকে গুটিকয়েক ম্যাচে মোহনবাগান সেরকম ভাল পারফরমেন্স তুলে ধরতে পারেনি, অতএব ছাটাই করে দাও কোচকে। এ অবস্থা চলে আসছে বছরের পর

বছর। একবারও দেখা হয় না কি অবস্থার মধ্যে কিসব খেলোয়াড় নিয়ে কাজ করতে হয় কোচকে। যে দলের ডিফেন্সে এত ফাঁকফোকরে, তারা শুধু আলফ্রন্টে ওডাপে, ব্যারেটো, সুনীল ছেত্রীর দৌলতে জাতীয় লিগ জিতে যাবে, এরকম ভাবার কোনও কারণ আছে কি?

ইস্টবেঙ্গল কর্তারা তবু আধুনিক চিন্তাভাবনা ইনপুট করতে পেরেছে ক্লাবে। যেমন ইস্টবেঙ্গল ফুটবল স্কুল তৈরি হয়েছে, যা থেকে ভবিষ্যতের ফুটবলার উঠে আসবে। ইউরোপের কোনও একটি দেশের নামী ফুটবল অ্যাকাডেমি বা স্কুলের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এই ফুটবল স্কুল চালাতে চায় ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। দেখতে হবে তো যেন ইস্টবেঙ্গল-লেস্টার চুক্তির মতো ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়। তবে সে সময় শুধুই ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল, ক্লাব কর্তারা প্রাতিষ্ঠানিক-বাণিজ্যিক দিকগুলোর কথা অত ভাল না বোঝায় এই গাঁটছড়া দাঁড়ায়নি। এই ক্ষেত্রে বেসরকারি মার্কেটিং ও স্পোর্টস প্রমোশন সংস্থা বকলমে চুক্তি ও তার বাণিজ্যিক দিকগুলো দেখবে। তাই আশা করা যায় এই চুক্তি দীর্ঘমেয়াদী ও ফলপ্রসূ হবে।

সাম্প্রতিককালে অবশ্য দেশের ঘরোয়া ফুটবলে কলকাতার ক্লাবগুলির মধ্যে নজরকাড়া পারফরমেন্স তুলে ধরেছে প্রয়াগ ইউনাইটেড। নিজেদের ময়দানে কোনও মাঠ বা তাবু নেই। সল্টলেকে মিউনিসিপাল স্পোর্টস আকাদেমির মাঠ ও ড্রেসিংরুম ব্যবহার করে। আরও কতকিছু নেই। সেই রাজ্যের অধিবাসী হয়েও প্রয়াগ ফুটবলাররা কিন্তু মাঠে নামলেই অন্যরূপ ধারণ করে। জাতীয় লিগে অনেক বড় বড় অঘটন ঘটিয়েছে। ঘুম কেড়ে নিয়েছে ডেম্পো, চার্চিল ব্রাদার্স, সালগাওকর বা নাম তুলে নেওয়া মাহিন্দ্রর মতো বড় দলের। সুব্রত ভট্টাচার্য অনেক নিষ্ঠা ও পরিশ্রম করে এই দলটাকে গড়ে তুলেছেন। লড়াইয়ের স্পিরিট তুলে দিয়েছেন খেলোয়াড়দের মননে। বর্তমান কোচ সঞ্জয় সেনও যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও পরিশীলিত। সুব্রতর দেখানো পথেই কোচিং করিয়ে দলকে বৈতরণী পার করিয়ে দিয়েছেন বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে।

তবে ইস্টবেঙ্গল, প্রয়াগ বা মোহনবাগানের দৌড় কিন্তু ম্যারাথন জাতীয় লিগে শেষপর্যন্ত জারি থাকছে না। এ ব্যাপারটা কয়েক বছর ধরেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। শেষ ল্যাপে টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাচ্ছে ডেম্পো সালগাওকররা। বিগত সাতটি লিগে এ ঘটনা হয়ে এসেছে। ডেম্পো পাঁচবার, সালগাঁওকর ও মাহিন্দ্রা ইউনাইটেড একবার করে চাম্পিয়ন হয়েছে শুধুমাত্র তুল্যমূল্য ধারবাহিকতা বজায় রেখে খেলে। আসলে মুম্বাই বা গোয়ার ক্লাবগুলোকে সারা বছরে এত টুর্নামেন্ট খেলতে হয় না। শুধু জাতীয় লিগের দিকে তাকিয়েই দল গড়ে ও যাবতীয় পরিকল্পনা নেয়। তার ওপর সমর্থকদের বিপুল প্রত্যাশা বা চাপ বহন করতে হয় না। ভাল খেললে বাড়তি ইনসেনটিভ পাওয়া যায়। মোটা অর্থের পারিশ্রমিক চাকুরিতে নির্ভরতা দেয় ক্লাবগুলি। সব মিলিয়ে ভাল খেলার আনন্দটা প্রথম থেকেই তৈরি হয়ে যায়। যে কারণে কলকাতার বড় ক্লাবে খেলার মোহ কাটিয়ে অনেক বাঙালি ফুটবলার গোয়ায় চলে যাচ্ছেন।

দেশের সেরা এমনকি এশিয়ার অন্যতম সেরা গোলকিপার সুব্রত পাল পুণে ছেড়ে কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতায় আসবেন না, যত টাকার অফার থাকুক না কেন। তাই ভারতীয় ফুটবলের ভরকেন্দ্র এখন গোয়া। কলকাতা কাগজে-কলমে ফুটবলের তীর্থ, কাজের কাজ যা কিছু হচ্ছে তা ওই গোয়ায়।

শব্দরূপ-৬২৩ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

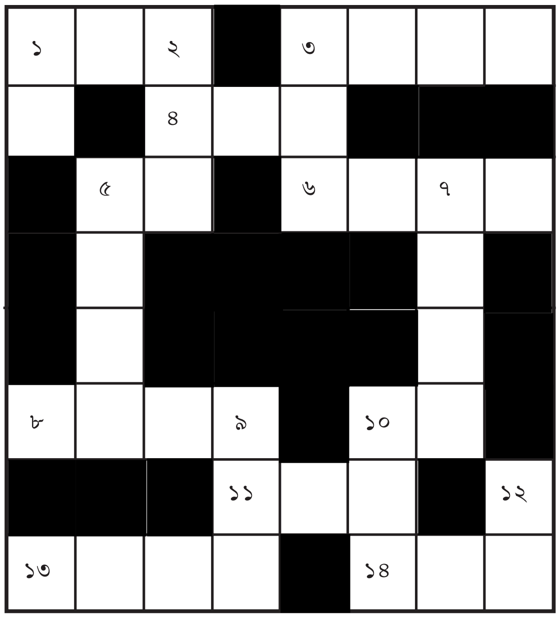

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. জন্মপত্রিকা, ৩. বিষ্ণুর বামনাবতার, ৪. গৌরী, পার্বতী, ৫. নয়নবারি, অশ্রু, ৬. ‘‘যত দোষ,—’’ ৮. দিনাজপুর অঞ্চলে প্রসিদ্ধ উৎকৃষ্ট লঘু চাউল, ১০. দক্ষকন্যা, ভগবতী, ১১. কুলত্যাগিনী, ১৩. সগর-রাজার পুত্র বিশেষ, ১৪. যযাতির পিতা।

উপর-নীচ : ১. পিতলের পাতলা কলসী, ঠোঙা, ২. জোর, উচ্চরবে প্রচার, ৩. স্রোতের প্রতিকূল দিক্, ৫. রামায়ণে উক্ত অঙ্গদেশের রাজা, ৭. উদয়ন রাজার বীণা, ৯. লতাগৃহ, তরুলতাবেষ্টিত স্থান, ১০. একটানা, সোজা, ১২. রাশিচক্রের দ্বিতীয় রাশি।

সমাধান
শব্দরূপ-৬২০

উ	র	গ		জ	য়	দ্র	থ
লু		র	ম	ল			
	শি	ব		সা	র	মে	য়
	শু					ঘ	
	পা					না	
ম	ল	মা	স		গো	দ	
			ই	ক্ষ্বা	কু		ক
চ	ন্দ্র	হা	স		ল	কু	চ

সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

৬২৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ২১ মে, ২০১২ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে ‘‘চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি’’—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী।

উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

‘‘ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T.’’

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা—
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ।। ২০

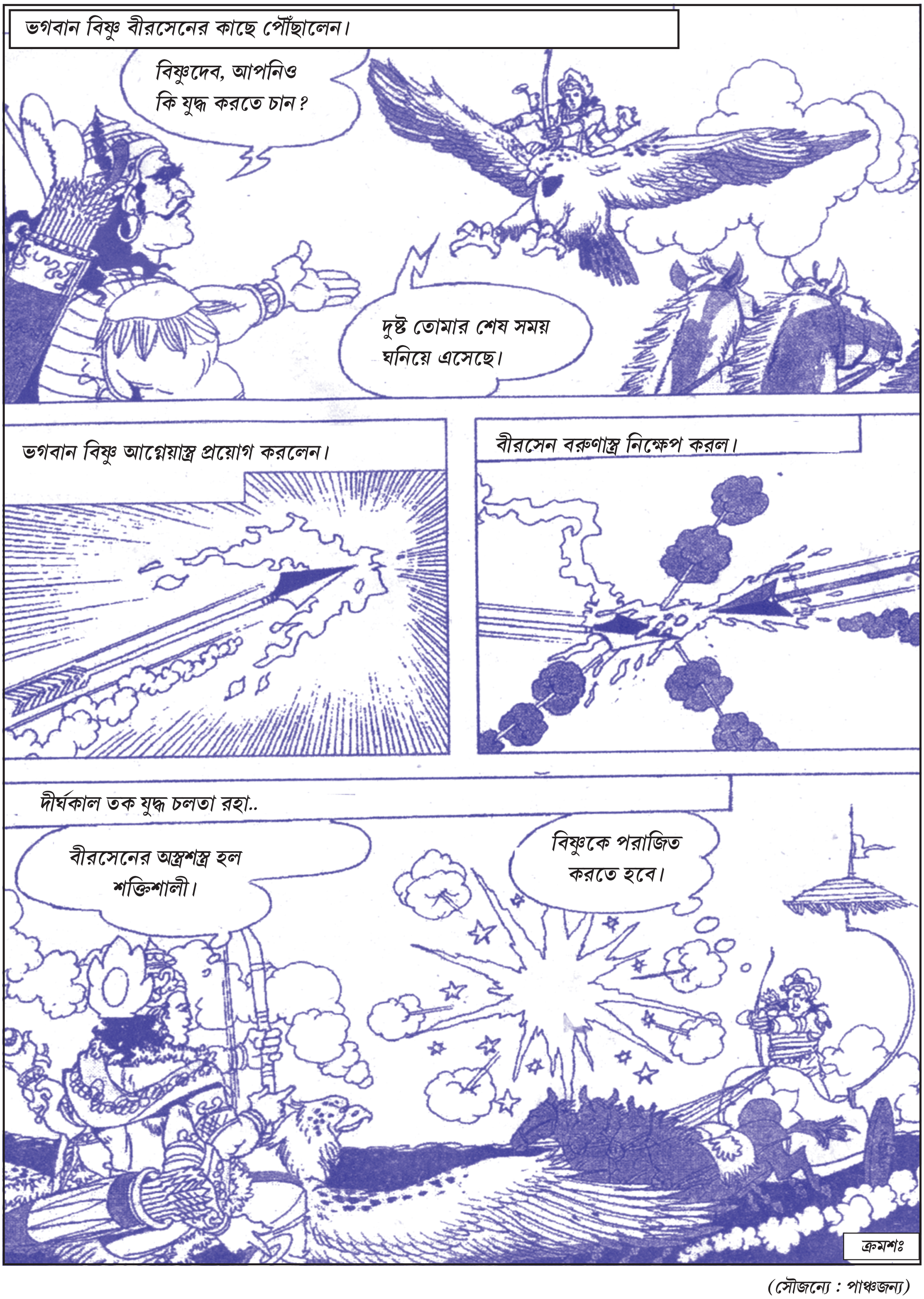

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

কালনায় পুরোহিতদের ভাতার দাবি

গত ১২ এপ্রিল কালনার নৃপপল্লীতে ভারতীয় পুরোহিত সমাজের উদ্যোগে পুরোহিতদের এক সমাবেশ আয়োজিত হয়। সংস্থার সভাপতি মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে কালনা মহকুমার গ্রাম ও শহরের প্রায় শ'দুয়েক পুরোহিত এই পুরোহিত সমাজের সদস্য হয়েছেন। ইমামদের মতো রাজ্যের পুরোহিতদের জন্যও প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, পুরোহিত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বিনা পয়সায় পড়াশুনোর ব্যবস্থা, গরীব গৃহহীন পুরোহিতদের জন্য মাথাগোঁজার ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি বিদ্যালয়গুলিতে নীচু শ্রেণী থেকেই সংস্কৃত শিক্ষা চালু করা ও পুরোহিতদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সাত দফা দাবিতে সংস্থার পক্ষ থেকে কালনা মহকুমা শাসকের মারফত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের দাবি--- ''মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর জন্য ভাতা ও অন্য অনেক সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করছেন, তখন আমরা চাই, তিনি পুরোহিতদের জন্যও দ্রুত এই ব্যবস্থা ঘোষণা করুন।'' পুরোহিত সমাজের এই দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলমান ভোট-ব্যাঙ্কের তাগিদে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই দাবি কতটা গ্রহণযোগ্য হবে বা আদৌ হবে কি না তা সময়ই বলবে।

মুর্শিদাবাদের জলঙ্গীতে মুসলিম তাণ্ডব

রবীন সেনগুপ্ত : বহরমপুর ॥ সম্প্রতি রাজ্যের সর্বাধিক মুসলমান অধ্যুষিত জেলা মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী থানার অন্তর্ভুক্ত কাজিপাড়া গ্রামে একটি হিন্দু ক্লাব ঘরের লাগোয়া জমিকে অন্যায় ভাবে দখল করে মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে হাজার হাজার মুসলমান জনতা সুপরিকল্পিত ভাবে তাণ্ডব চালায়। গত ২৯ মার্চ এই ঘটনার সূচনা। তারপর দফায় দফায় আক্রমণ লুঠপাট ভাঙচুর। অতপর পুলিশের হস্তক্ষেপ এবং আদালতে চার্জশিট পেশ। জেলাশাসকের নিকট বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে দুষ্কৃতীদের শাস্তির দাবীতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

কাজীপাড়া জনকল্যাণ সমিতি নামে একটি হিন্দু প্রধান সংগঠনের কার্যালয়ের সামনে অনেকখানি ফাঁকা জমি রয়েছে। মুসলমানরা এই জমিটি দখল করে মসজিদ নির্মাণ করতে চায়। তাই নিয়েই বিবাদের সূত্রপাত। কয়েক হাজার মুসলমান সমবেত ভাবে ওই স্থানটির দখল নিতে চায়। ওই জলকল্যাণ সমিতিটি সরকারি ভাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত। সরকারের কাছ থেকে তারা আর্থিক অনুদানও পেয়েছে। সেই অনুদানের অর্থে বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক কাজও তারা ইতিমধ্যেই করেছে। জলঙ্গী এলাকাটি সীমান্তবর্তী এলাকা এবং মুসলমানের বৃদ্ধির হার অত্যধিক। তাদের অত্যাচারও সেখানে মাত্রাছাড়া বলে অভিযোগ। তবু ওরই মধ্যে পুলিশ কিছু ব্যবস্থা নেয়। আদালতে বিষয়টি নিয়ে আসা হলে সেখানেও বহু মুসলমান সমবেত হয়ে বিচারক ও আইনজীবীদের সঙ্গে ক্রমাগত বচসা করতে থাকে। হাতাহাতি অবধি হয়। হিন্দুদের স্থানীয় অধিবাসী ভাদু সাহার নাবালক পুত্র নিউটন সাহাকে পুলিশ অন্যায় ভাবে গ্রেপ্তার করায় স্থানীয় হিন্দুরা বিক্ষুব্ধ হয়েছে। তবে পুলিশ প্রশাসন ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিলিত উদ্যোগে জবরদখল থেকে আপাতত রক্ষা পেয়েছে স্থানটি।

মুসলমান সাবালিকাকে বিয়ে করে হুমকির মুখে হিন্দু যুবকের পরিবার

অজয়কান্তি সরকার : বালুরঘাট ॥ ঘটনার সূত্রপাত গত ৭ এপ্রিল। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর ২নং ব্লকের তড়িয়াল অঞ্চলের পশ্চিম গণ্ডাল গ্রামের ধরণীধর প্রামাণিক ও তাঁর পরিবার এখন অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। ওইদিন ধরণীধরের ছেলে মনেশ প্রামাণিক পাশের গ্রামের রুবিনা খাতুন (পিতা— মহম্মদ আলম)-কে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। আর তারপর থেকেই ধরণীধরবাবু ও তাঁর পরিবারের ওপর নানারকম অত্যাচার শুরু হয়। রুবিনা খাতুন প্রাপ্তবয়স্কা হলেও তার পরিবারের লোকজন জোর করে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্য অনবরত ধরণীধরবাবুর বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিচ্ছে। এমনকী প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি, ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার হুমকিও আসছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের কাছে নালিশ করতেও শঙ্কিত ধরণীধর প্রামাণিকের বাড়ির লোকেরা। কারণ এরাজ্যে প্রায় বছর পাঁচেক আগে ঘটে যাওয়া 'রিজওয়ানুর কাণ্ড' যতটা 'রাজনৈতিক গুরুত্ব' অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, বর্তমান ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীতটাই হওয়ার সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভোট ব্যাঙ্ক বড় বালাই।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
30 April - 2012

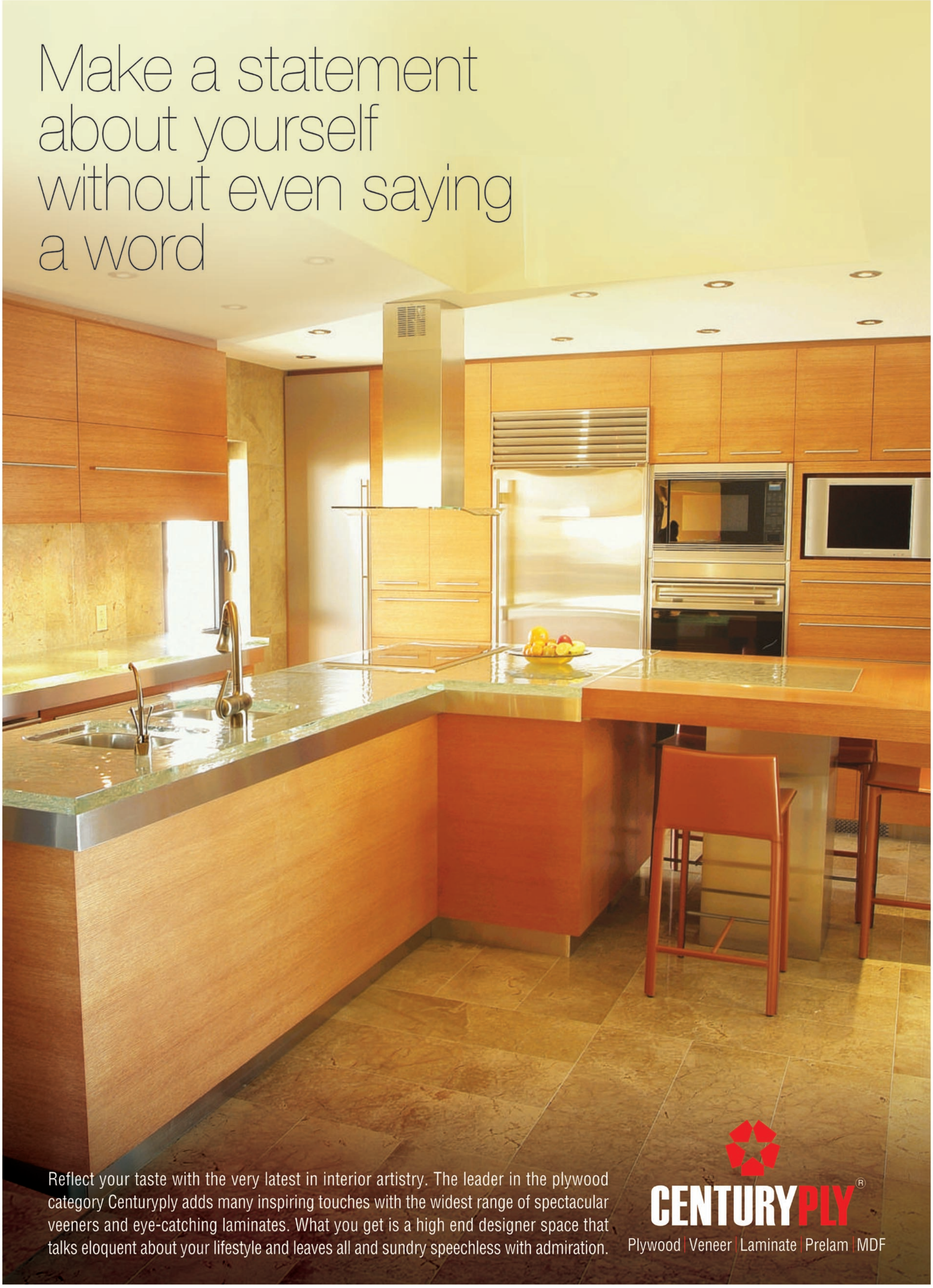

দাম : ৭.০০ টাকা